PREFACE

With its grounding in the "guiding pillars of Access, Equity, Equality, Affordability and Accountability," the New Education Policy (NEP 2020) envisions flexible curricular structures and creative combinations for studies across disciplines. Accordingly, the UGC has revised the CBCS with a new Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP) to further empower the flexible choice based credit system with a multidisciplinary approach and multiple/ lateral entry-exit options. It is held that this entire exercise shall leverage the potential of higher education in three-fold ways – learner's personal enlightenment; her/his constructive public engagement; productive social contribution. Cumulatively therefore, all academic endeavours taken up under the NEP 2020 framework are aimed at synergising individual attainments towards the enhancement of our national goals.

In this epochal moment of a paradigmatic transformation in the higher education scenario, the role of an Open University is crucial, not just in terms of improving the Gross Enrolment Ratio (GER) but also in upholding the qualitative parameters. It is time to acknowledge that the implementation of the National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) National Credit Framework (NCrF) and its syncing with the National Skills Qualification Framework (NSQF) are best optimised in the arena of Open and Distance Learning that is truly seamless in its horizons. As one of the largest Open Universities in Eastern India that has been accredited with 'A' grade by NAAC in 2021, has ranked second among Open Universities in the NIRF in 2024, and attained the much required UGC 12B status, Netaji Subhas Open University is committed to both quantity and quality in its mission to spread higher education. It was therefore imperative upon us to embrace NEP 2020, bring in dynamic revisions to our Undergraduate syllabi, and formulate these Self Learning Materials anew. Our new offering is synchronised with the CCFUP in integrating domain specific knowledge with multidisciplinary fields, honing of skills that are relevant to each domain, enhancement of abilities, and of course deep-diving into Indian Knowledge Systems.

Self Learning Materials (SLM's) are the mainstay of Student Support Services (SSS) of an Open University. It is with a futuristic thought that we now offer our learners the choice of print or e-slm's. From our mandate of offering quality higher education in the mother tongue, and from the logistic viewpoint of balancing scholastic needs, we strive to bring out learning materials in Bengali and English. All our faculty members are constantly engaged in this academic exercise that combines subject specific academic research with educational pedagogy.We are privileged in that the expertise of academics across institutions on a national level also comes together to augment our own faculty strength in developing these learning materials. We look forward to proactive feedback from all stakeholders whose participatory zeal in the teaching-learning process based on these study materials will enable us to only get better. On the whole it has been a very challenging task, and I congratulate everyone in the preparation of these SLM's.

I wish the venture all success.

Professor Indrajit Lahiri
Vice Chancellor

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)

Course Title : Bengali Politcal History I (Earliest Times to 1203/1204)

Course Code : NEC-HI-01

1st Print : March, 2025
Print Oder :
Memo No :
Date :

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি ও জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission & NEP-2020.

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)

Course Title : Bengali Politcal History I (Earliest Times to 1203/1204)

Course Code : NEC-HI-01

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

বর্ণনা গুহ ঠাকুরতা (ব্যানার্জি)
Director, school of Social Sciences, NSOU

চন্দন বসু
Professor of History and Chairperson, BoS, NSOU

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History, NSOU

অমল দাস
Professor of History (Former), Unifersity of Kalyani

সব্যসাচী চ্যাটার্জি
Professor of History, University of Kalyani

মহুয়া সরকার
Professor of History (Former), Jadavpur University

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History Purulia

রূপকুমার বর্মণ
Vice-Chancellor, bankura University Purulia

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History Shyamsundar College

: পাঠ রচয়িতা :

অরুণিমা রায়চৌধুরী
Assistant Professor of History Sundarban Mahavidyalaya

এবং

চন্দন বসু
Professor of History NSOU

: পাঠ সম্পাদনা :

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History School of Social Sciences, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History School of Social Sciences,NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG : History
(NHI)

Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title : Bengali Politcal History I (Earliest Times to 1203/1204)
Course Code : NEC-HI-01

পর্যায়-১ : প্রাচীন বাংলা : ভূগোল, আঞ্চলিক বিভাগ এবং জনসংখ্যা কাঠামো

একক ১ ❑ পূর্ব ভারত 7

একক ২ ❑ আদি বাংলার ঐতিহাসিক বিভাগ 14

একক ৩ ❑ জনসংখ্যার কাঠামো 22

পর্যায়-২ : শশাঙ্কের উত্থান পর্যন্ত বাংলার প্রাথমিক ইতিহাস

একক ৪ ❑ ধ্রুপদী সাহিত্যে বেঙ্গল : গঙ্গারিডাই 28

একক ৫(ক) ❑ গুপ্ত শাসনের আগে বাংলা 36

একক ৫(খ) ❑ বাংলায় স্বাধীন রাজ্য 42

একক ৫(গ) ❑ সমতট অথবা বঙ্গ রাজ্য 46

একক ৬ ❑ গৌড়ের উত্থান 52

একক ৭ ❑ শশাঙ্ক 58

পর্যায়-৩ : পাল সাম্রাজ্য

একক ৮(ক) ❑ পাল সাম্রাজ্য গঠনের পূর্বে বাংলার অবস্থা 64

একক ৮(খ) ❑ পালদের উৎপত্তি ও আদি ইতিহাস 69

একক ৯ ❑ পাল সাম্রাজ্য : ধর্মপাল (৭৭০-৮১০), দেবপাল (৮১০-৮৫০) 75

একক ১০ ❑ পাল সাম্রাজ্যের পতন 85

একক ১১ ❑ পাল যুগে স্বাধীন রাজ্য 91

পর্যায়-৪ : সেন বংশ

একক ১২ ❑ সেন সাম্রাজ্য 96

একক ১৩ ❑ সেন রাজা—সামন্তসেন থেকে লক্ষ্মণসেন 100

একক ১৪ ❑ লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারীগণ 109

পর্যায়-৫ : প্রশাসন

একক ১৫ ❑ প্রশাসনের রূপরেখা : মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিবর্তন 115

পর্যায়-১
প্রাচীন বাংলা : ভূগোল, আঞ্চলিক বিভাগ এবং জনসংখ্যা কাঠামো

একক ১ ❑ পূর্ব ভারত

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ ভূমিকা
১.২ অবস্থান
১.৩ ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগ
১.৪ নদী ব্যবস্থা
১.৫ মাটি
১.৬ উদ্ভিদ ও কৃষি
১.৭ জলবায়ু
১.৮ সারাংশ
১.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
১.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- পূর্ব ভারতের ভৌগলিক ও পরিবেশগত কাঠামোকে বিস্তৃত পরিসরে অধ্যয়ন করা।
- শিক্ষার্থীরা পূর্ব ভারতের ভূমি সংস্থান, নদী ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত প্রেক্ষিত সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পূর্ব ভারতের উদ্ভিদসমূহ ও কৃষি ব্যবস্তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন।
- পূর্ব ভারতের জলবায়ু এই এককের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

১.১ ভূমিকা

ভূগোল ইতিহাস এবং ভূগোল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত দুটি শাখা। ভৌগলিক কারণগুলি যে কোনও অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিকগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তাই বলাই বাহুল্য যে, প্রাচীন বাংলার

D:\Suvendu\NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof\ (Dt. 18.03.2025)

আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট তৈরিতে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব ছিল। Beajeau-Gariner এর মতে, "একটি অঞ্চল হল স্থানিক একক যা এটিকে ঘিরে থাকা স্থান থেকে আলাদা"। ভূগোলবিদগণ বাংলাকে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক একক রূপে দেখেছেন। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত অববাহিকায় এই ভূখণ্ড গঠিত হয়েছে। বঙ্গীয় অববাহিকার কাঠামোগত বিবর্তন, তুলনামূলকভাবে নতুন পলিমাটি ভূমি, বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং ভারী বর্ষা এই অঞ্চলের বিশেষ ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য। উত্তর-পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় এবং দক্ষিণ-পূর্বে লালমাই ও চট্টগ্রাম রেঞ্জ দ্বারা বেষ্টিত এই অঞ্চলের সমতলতা একটি নিচু ভূমির সৃষ্টি করে, যা উত্তরের উচ্চ মালভূমি থেকে ধীরে ধীরে বঙ্গোপসাগরের দিকে ঢালু হয়ে যায়। বাংলা ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এবং দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ স্থল অঞ্চলসহ একটি "পরিবর্তনশীল ভূখণ্ড"। অনেক নদী ও তাদের উপনদী, জলাভূমি এবং জলবায়ু পরিস্থিতি বাংলার ভূ-খণ্ডের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

১.২ অবস্থান

বাংলা ২০°৩৪"N এবং ২৬°৩৮"N অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°০১" এবং ৯২°৪১"E দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্তিত যা ১৪৩,৯৯৮ বর্গ কিমি এবং সমন্বিত, সাম্প্রতিক অনুমান অনুসারে, প্রায় ১১০ মিলিয়ন জনসংখ্যা। প্রতি বর্গ কিমি জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব অনুমান করা হয়েছে ৭১৪। এটি পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্বে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং উত্তরে ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ১৯৪৭ সালের আগে এটি ছিল বৃহত্তম প্রদেশ এবং ব্রিটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অংশ। বাংলার পরিবেশগত অবস্থা সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়।

১.৩ ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগ

ফিজিওগ্রাফি শব্দটি ভূতাত্ত্বিক উপাদানের সংমিশ্রণের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকে বোঝায় যেখানে বিশেষ ধরণের মাটি তৈরি হয়েছে এবং যে ভূভাগে সেগুলি ঘটে। ফিজিওগ্রাফির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ বা ব্রিটিশ ভারতের সাবেক বঙ্গ প্রদেশের সমগ্র অঞ্চলকে কয়েকটি উপ-অঞ্চল ও এককে ভাগ করা যায়। বি.এল.সি. জনসন এই অঞ্চলটিকে নয়টি ভূপ্রাকৃতিক এককে ভাগ করেছেন। ওকস্পেট (Ohkspate) বাংলাকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেছিল যেমন উত্তরের বদ্বীপ সদৃশ অঞ্চল—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দোয়াব, পূর্ব প্রান্তিক এবং দক্ষিণে ব-দ্বীপ। ভূপ্রকৃতি বিশ্লেষণের পাসাপাশি ভূবিজ্ঞানীরা বাংলাকে ভৌতবিজ্ঞানের ভিত্তিতেও বিস্তৃত শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। ফিজিওগ্রাফি অধ্যয়নের বিকাশের সাথে সাথে এই অঞ্চলের পণ্ডিতদের দ্বারা আরও বিশদ ভৌতবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে এটিকে প্রায়

২৪টি উপ-অঞ্চলে এবং পরিপূর্ণ ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রায় ৫৪টি এককে ভাগ করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিজিওগ্রাফিকাল একক নিম্নরূপ :

১. পুরাতন হিমালয় পাদদেশীয় সমতল

২. তিস্তা বিধৌত সমভূমি

৩. করতোয়া বিধৌত সমভূমি

৪. নিম্ন আত্রাই অববাহিকা

৫. নিম্ন পূর্ণভবা প্লাবনভূমি

৬. ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি

৭. গঙ্গা নদীর বিধৌত সমভূমি

৮. গঙ্গার জোয়ারের বিধৌত সমভূমি

৯. গোপালগঞ্জ-খুলনা বিল

১০. আড়িয়াল বিল

১১. মেঘনা নদীর বিধৌত সমভূমি

১২. মেঘনা মোহনা বন্যা সমভূমি

১৩. সুরমা-কুশিয়ারা বিধৌত সমভূমি

১৪. উত্তর এবং পূর্ব পাদদেশীয় সমভূমি

১৫. চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি

১৬. সেন্ট মার্টিনের প্রবাল দ্বীপ

১৭. বরেন্দ্রভূমি

১৮. মধুপুর ট্র্যাক্ট

১৯. উত্তর এবং পূর্ব পাহাড়

২০. আখাউড়া সোপান এই অঞ্চলগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গার বিধৌত সমভূমি এবং গঙ্গা নদীর জোয়ারের বিধৌত সমভূমি।

অধ্যাপক এইচ সি রায়চৌধুরী বাংলা অঞ্চলের ভৌত বিভাজনকে রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বিভাজনের সাথে তুলনা করার চেষ্টা করেছিলেন। তার মতে "প্রকৃতির হাত প্রদেশটিকে চারটি মহাবিভাগে বিভক্ত করেছে যা ঐতিহাসিক যুগে এর প্রধান রাজনৈতিক বিভাগের সাথে মোটামুটি মিলে যায়। গঙ্গার প্রধান শাখার উত্তরে, বর্তমানে পদ্মা নদী নামে পরিচিত, এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিমে, বিস্তৃত অঞ্চল যা আধুনিক রাজশাহী বিভাগ এবং কোচবিহার জেলাকে স্পর্শ করে। এই এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি

পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীন ভূমি গঠন করেছিল যার মধ্যে বরেন্দ্রী একটি সুপরিচিত জেলা (মণ্ডল) ছিল। গঙ্গা নদীর অন্য একটি শাখার পশ্চিমে, নাম ভাগীরথী বা হুগলি, মহান বর্ধমান বিভাগকে প্রসারিত করেছে—প্রাচীন কালের বর্ধমানভুক্তি। এই এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাচীন রাঢ়ের সমৃদ্ধ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। ভাগীরথী নদী, পদ্মা নদী, ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন প্রান্ত এবং মেঘনার মোহনার মধ্যে অবস্থিত বাংলার কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রেসিডেন্সি বিভাগের বেশিরভাগ অংশ এবং ঢাকা বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে স্পর্শ করে। এই অঞ্চলটি প্লিনি এবং টলেমির কাছে গঙ্গারিডাইয়ের অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল এবং কালিদাসের কাছে বঙ্গদের দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল যারা নৌকা পরিচালনার দক্ষতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। মেঘনার পর এই অঞ্চলটি চট্টগ্রামকে স্পর্শ করেছে এবং সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

১.৪ নদী ব্যবস্থা

বাংলা প্রাচীনকাল থেকেই নদীমাতৃক দেশ। প্রকৃতপক্ষে এটি বাংলার ভূখণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই ভূখণ্ডের প্রায় ২৩০টি বড় ও ছোট নদীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নদী হল গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী। তিস্তা নদীও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকে তিস্তা উত্তরবঙ্গের ছোটো ছোটো নদী ও নালার জন্য জলের একটি প্রধান উৎস। প্রাচীনকালে উত্তরাঞ্চলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল করতোয়া। কিন্তু এখন তা প্রায় শুকিয়ে গেছে। গঙ্গা নদীটি বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃত নিষ্কাশন ব্যবস্থা গঠন করেছে হিমালয়ের গোমুখ হিমবাহ থেকে নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং রাজমহল পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাংলার সমতল-ভূমিতে প্রবেশ করে। প্রায় তার জলকে স্পর্শ করেছে। এটা নিছক দুর্ঘটনা নয় যে গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, পান্ডুয়ার মতো বিখ্যাত রাজধানী শহরগুলি এই অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। মৎস্যপুরাণ অনুসারে গঙ্গা নদী রাজমহল, সাঁওতালভূম, ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূম, উত্তর রাঢ়, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে বাংলার ইতিহাস নির্মাণ করেছে তার অজস্র নদনদী। উত্তর ও পূর্ব ভারতের দুটি প্রধান নদী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, তাদের বিপুল জলরাশি ও পলিপ্রবাহ বাংলাদেশে বহন করে নিয়ে আসে। বাংলার অবস্থান গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নদীবিধৌত সমতল ভূমিতে। বাংলার দক্ষিণ সীমায় এই সকল নদনদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকেই এই নদনদীগুলি ছিল পণ্য পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বাংলার কৃষি ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সামাজিক উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। পরিবেশগত শর্তের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। গঙ্গার খাত পরিবর্তন বাংলার নদীমাতৃক ইতিহাসের অন্যতম বড় ঘটনা। গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর প্রধান শাখা পদ্মা নদী নামে পরিচিত। এই নদী আরও পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথমে পদ্মা নদী মূল স্রোত ছিল না। খ্রিস্টীয় ১৬ শতকের শুরুতে ভাগীরথী নদীর অন্যান্য স্রোত খুব অগভীর স্রোতে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এভাবে পদ্মা নদী নামে পরিচিত অন্য স্রোতটি গঙ্গা নদীর মূল স্রোতে পরিণত হয়। পদ্মা নদীও সময়ে সময়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করে। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী পদ্ম নদীর সাথে মিশেছে

তার নিম্ন গতিপথে।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ নদী সাধারণত দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে মিশেছে। এর মধ্যে তিস্তা, মহানন্দা, তোর্সা, কোশী প্রভৃতি নদী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিস্তা নদী তিনটি বড় চ্যানেল নিয়ে গঠিত—করতোয়া, পূণর্ভাবা এবং আত্রাই। বাংলার ভূমিকে নদীর ভূমিও বলা যায়। এটি এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। বাংলার উর্বর কৃষি ব্যবস্থা এই নদী-নালার সৃষ্টি। কিন্তু একই সঙ্গে এইসব নদীর গতিপথের ঘনঘন পরিবর্তন অনেক পুরনো স্থান ধ্বংসের জন্য দায়ী। কখনও কখনও এটি তাদের ধুয়ে ফেলে এবং কখনও কখনও তাদের অস্বাস্থ্যকর এবং দুর্গম করে। অধ্যাপক এইচ সি রায়চৌধুরী প্রাচীন অঞ্চল সমূহের ধ্বংসে নদী ব্যবস্থার ভূমিকার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে কোশ নদীর খাত স্থানান্তরের ফলে জলাভূমি এবং বন্যার জন্ম হয়েছিল যা গৌড় নগরীর ধ্বংসের জন্য অবদান রেখেছিল। পদ্মা নদীর বিধ্বংসী প্রভাবের কথা ইতিহাসে সুবিদিত। নদীর খাতের ঘনঘন পরিবর্তনের পাশাপাশি, ভাগীরথী এবং পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির পলির বিশাল সঞ্চয় এর ভৌত দিকটিকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন করার জন্য একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। পলি জমার জন্য ক্রমাগত কিছু এলাকায় জমির স্তর বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য অঞ্চলকে তুলনামূলকভাবে নিম্ন এবং জলাবদ্ধ করে তোলে। অনেকে মনে করেন যে সুন্দরবন এক সময় জনবহুল ছিল কিন্তু প্রকৃতির বিপর্যয় এবং মগ ও পর্তুগিজদের অত্যাচারের ফলে জনবসতি বিনষ্ট হয়।

১.৫ মাটি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলার ভূমি তার বিস্তৃত নদী ব্যবস্থার উপহার। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে বাংলার মৃত্তিকা বেশির ভাগই পলি দিয়ে তৈরি। ভৌততত্ত্বের বিচারে মাটির ধরনকে তিনটি বিস্তৃত এককে ভাগ করা যায় যেমন বন্যার সমতল মাটি, পাহাড়ি মাটি এবং সোপান মাটি। বন্যার সমতল মৃত্তিকাকে আরও ১৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন—১) চুনযুক্ত পলিমাটি; ২) চুনবিহীন পলি; ৩) চুনযুক্ত বাদামী প্লাবন সমতল মাটি; ৪) চুনযুক্ত ধূসর প্লাবন সমতল মাটি; ৫) চুনযুক্ত গাঢ় ধূসর প্লাবন সমতল মাটি; ৬) চুনহীন ধূসর প্লাবন সমতল মাটি; ৭) চুনহীন বাদামী প্লাবন সমতল মাটি; ৮) চুনহীন গাঢ় প্লাবন সমতল মাটি; ৯) কালো ভূখণ্ডের মাটি; ১০) অ্যাসিড বেসিন কাদামাটি; ১১) অ্যাসিড সালফেট মাটি; ১২) পিট; এবং ১৩) ধূসর পাদদেশীয় মাটি। সোপানের মাটিকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—১) অগভীর লাল বাদামী সোপান মাটি; ২) গভীর লাল বাদামী সোপান মাটি; ৩) বাদামী ছিদ্রযুক্ত সোপান মাটি; ৪) অগভীর ধূসর সোপান মাটি; ৫) গভীর ধূসর সোপান মাটি; এবং ৬) ধূসর উপত্যকার মাটি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট জমি। কখনও কখনও চাষের জমিতে মাটি কৃত্রিমভাবে তোলা হয়। এটি কৃত্রিম ভূমি নামে পরিচিত।

১.৬ উদ্ভিদ ও কৃষি

বাংলার উর্বর ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক গাছপালা রয়েছে। সবচেয়ে সাধারণ গাছ হল আম, কাঁঠাল, বট, শিরীষ, তাল, বাঁশ এবং নারকেল। এগুলি ছাড়াও সেগুন, মেহগনি, শাল প্রভৃতি এবং সুন্দরী, গরান ও ক্যাওড়ার মতো ম্যানগ্রোভও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গাছ। বাংলার প্রধান কৃষি পণ্য ধান। আখ বাংলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য। প্রাচীন বাংলার ধান চাষ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বাংলায় বহু ধরনের ধান উৎপাদন হত। 'শালি' ছিল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধান। অপেক্ষাকৃত কম মানের ধান ছিল বোরো, ওড় (বা ওড়ী), কাংনি প্রভৃতি। আনুলিয়া তাম্রশাসনে হেমন্ত সেনের উত্থানের সঙ্গে হেমন্তকালে শালি ধান পেকে ওঠাকে তুলনা করা হয়েছে। সদুক্তিকর্ণামৃততে বলা হয়েছে হেমন্তকালে কৃষকের ঘর শালি ধানে পূর্ণ থাকে।

পরিবেশগত কারণেই বাংলা একটি কৃষি প্রধান দেশ। বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত এবং গ্রামের সন্নিহিত উর্বর জমি চাষ করে নানা শস্য এবং ফল প্রভৃতি উৎপাদন করত। ধান ব্যতীত আখ চাষের জন্য বাংলা প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত ছিল। আখের রস থেকে প্রচুর পরিমানে চিনি ও গুড় প্রস্তুত হত এবং এমনকি বাংলার বাইরের রপ্তানি হত। পাশাপাশি ছিল তুলো এবং সর্ষের চাষ। বপ্য-ঘোষবাট গ্রামের তাম্র পট্টোলীতে 'সর্ষপ-যানক' কথাটিতে বাংলায় সর্ষে চাষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১২২৫ খ্রিঃ একটি চিনা সাক্ষ্যে বাংলার উৎকৃষ্ট মানের তুলোর চাষের উল্লেখ আছে। বস্তুত ধানের মতন কাপাসের চাষ প্রাচীন বাংলায় সর্বব্যাপী ছিল। কাপাসের তুলো পিঁজে নিয়ে সুতো কাটা এই সময়কালে বাংলার একটি প্রধান কুটির শিল্প ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই কাজ বাড়ির বিশেষত দরিদ্র বাড়ির মেয়েরা করত।

১.৭ জলবায়ু

বাংলা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে এবং মে ও জুন মাসে তার শীর্ষে পৌঁছায়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে থাকে। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাস শীতলতম সময়। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলার ঋতু চক্র ছয়টি ঋতুতে বিভক্ত যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত। বাংলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬০ থেকে ২০০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। বার্ষিক আপেক্ষিক আর্দ্রতার গড় ৮০% থেকে ৬১% পর্যন্ত।

১.৮ সারাংশ

ভারতের তুলনায় বাংলার ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে মাত্রাগতভাবে কম, কিন্তু পাহাড়, সমুদ্র, নদী, অরণ্য, সমতলভূমি সমস্ত মিলিয়ে তা উপেক্ষণীয় নয়। বাংলার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল নদী, নালা, খাল, বিল এবং বিস্তৃত জলাভূমি, যা ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে বাংলাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। একই

সঙ্গে হিমালয় ও সমুদ্র বাংলাতেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পূর্ব দিকের এই প্রদেশের অরণ্য বৈচিত্র্যও অন্যন্য। সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবনে দেখতে পাওয়া যায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য, বঙ্গের অবশিষ্ট অংশে শাল, মহুয়া, পলাশ, সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি বৃক্ষ স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী উভয় প্রকার বৃক্ষই বাংলায় বর্তমান। সুপ্রচুর বৃষ্টিপাত ও উর্বর ভূমি বাংলাকে করে তুলেছে সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা। সুপ্রাচীন সময় থেকে নদী-বিধৌত সমতলভূমির পর্যাপ্ত কৃষিপণ্য সযত্নে লালনপালন করেছে বঙ্গভূমির সভ্যতাকে, তার সংস্কৃতিকে। এই ভূখণ্ডের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াও এই অঞ্চলের পরিবেশ, ভূপ্রকৃতি, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সার্বিক অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

১.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. পূর্ব ভারতের প্রাচীন ভূগোল সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২. প্রাচীন বাংলার নদী ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

১.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

ভট্টাচার্য, অমিতাভ, *প্রাচীন ও প্রাথমিক মধ্যযুগীয় বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোল*, কলকাতা, ১৯৭৭।

আইন, বিমলা চরণ, *প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ভূগোল*, দিল্লি, ১৯৮৪।

চক্রবর্তী, দিলীপ কে, *গঙ্গা সমভূমির প্রত্নতাত্ত্বিক ভূগোল : নিম্ন ও মধ্য গঙ্গা*, দিল্লি, ২০০১।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলকাতা, ১৯৯৩।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, ঢাকা, ২০১৭।

সুর, ড. অতুল, *বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, কলকাতা, ২০০৮।

মুরশিদ, গোলাম, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা, ২০০৬।

সেন, সুকুমার, *বঙ্গভূমিকা*, কলকাতা, ১৯৯১।

Chowdhury, Abdul Momin and Ranabir Chakravarti (Eds.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives (up to c. 1200 CE), Vol 1, Archaeology, Political History, Polity,* Dhaka, 2018.

Chowdhury, Abdul Momin and Ranabir Chakravarti (Eds.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives (up to c. 1200 CE), Vol 2, Society, Economy, Culture,* Dhaka, 2018.

একক ২ ❑ আদি বাংলার ঐতিহাসিক বিভাগ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ ভূমিকা

২.২ উপাদানসমূহের পর্যালোচনা

২.৩ পুণ্ড্রবর্ধন

২.৪ বঙ্গ

২.৫ গৌড়

২.৬ সমতট

২.৭ ক্ষুদ্র উপ-বিভাগ

২.৮ সারাংশ

২.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

২.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের ভূ-রাজনৈতিক বিভাগগুলি পর্যালোচনা করা।
- প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উপাদান বিশ্লষণ করা।
- প্রাচীন ভারতের নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি ভূ-রাজনৈতিক বিভাগ ছিল, সেইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা :
  - ☞ পুণ্ড্রবর্ধন
  - ☞ রাঢ়
  - ☞ বঙ্গ
  - ☞ গৌড়
  - ☞ সমতট

২.১ ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অঞ্চল সংজ্ঞায়িত করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ কারণ খ্রিস্টীয় ১১ শতক পর্যন্ত 'বাংলা' বলতে আমরা যা বুঝি তার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সহজ সুবিধার জন্য ব্রিটিশ প্রদেশ হিসেবে অবিভক্ত বাংলার ভূখণ্ডকে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা ভালো হবে। অধ্যাপক এইচ সি রায়চৌধুরী ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গ প্রদেশের এলাকাকে বর্ণনা করেছেন যে অঞ্চলটি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে সুবর্ণরেখার নিম্ন প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাক-১১ শতক খ্রিস্টীয় যুগে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক অধ্যয়নের একটি সত্তা হিসাবে আদি বাংলা অনেক একক ও উপ-একক নিয়ে গঠিত যার মধ্যে পাঁচটি ছিল বেশি বিশিষ্ট। এই পাঁচটি একক হল পুণ্ড্রবর্ধন, রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় এবং সমতট। আরও অনেক ছোট ছোট একক বা উপ-একক ছিল।

২.২ উপাদানসমূহের পর্যালোচনা

কোনো বৈদিক স্ত্রোত্রে বাংলার প্রাচীন ভূমির একক বা উপ-এককের কোনো উল্লেখ নেই। বঙ্গ নামের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে। 'বঙ্গবগধহ' অভিব্যক্তিটি বঙ্গ ও মগধের লোকদের নির্দেশ করে যারা ঐতরেয় আরণ্যকের মতে সীমালঙ্ঘনের জন্য দোষী ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও পুণ্ড্রদের সেই জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন যারা আর্যদের সীমান্তের বাইরে বসবাস করত এবং দাস হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ ছিল। প্রাচীন মহাকাব্য ও ধর্মসূত্রে বঙ্গের প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। বোধায়নের মতো প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলির অধিকাংশই বঙ্গকে বৈদিক সংস্কৃতির বাইরে থাকা নিকৃষ্ট সংস্কৃতির লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করেছিল। মহাকাব্যে একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায়। মহাভারত পূর্ব দিকে আর্য অভিবাসন প্রক্রিয়ার একটি স্পষ্ট চিত্র দেখায়। এখানে পাণ্ডবদের দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ভাই ভীম বর্তমান বাংলার দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন। রামায়ণে, বঙ্গের অধিবাসীদের আর অপবিত্র অসভ্য হিসাবে এড়িয়ে যাওয়া দেখতে পাওয়া যায় না। বরং তারা অযোধ্যার উচ্চ বংশীয় অভিজাতদের সাথে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। জৈন এবং প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গ ও পুণ্ড্রের নিয়মিত উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থ যেমন গ্রীক সাক্ষ্য, এরিথ্রিয়ান সাগরের পেরিপ্লাস, মিলিন্দাপানহা এবং অন্যান্যগুলিতে বাংলা অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় যা আমাদের আরও স্পষ্টভাবে বাংলার রাজনৈতিক-ভৌগলিক বিভাগ এবং প্রশাসনিক এককগুলিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম করে।

বাংলা অঞ্চলের আদি রাজনৈতিক-ভৌগোলিক বিভাগ : আমরা আগেই বলেছি যে যদিও এই অঞ্চলে অনেকগুলি রাজনৈতিক-ভৌগোলিক একক এবং উপ-একক ছিল যেগুলিকে আমরা সাধারণত বাংলা হিসাবে বিবেচনা করি, কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিল পাঁচটি একক। এগুলো হলো পুণ্ড্রবর্ধন,

রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় ও সমতট। এই একক এবং অন্যান্য ছোট এককগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

২.৩ পুণ্ড্রবর্ধন

পরবর্তীকালে বৈদিক গ্রন্থ এবং মহাকাব্যগুলিতে পুণ্ড্রদের কিছু বিক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই তাদের পুণ্ড্রবর্ধনের বাসিন্দা হিসাবে বর্ণনা করে—মুঙ্গেরের পূর্বে অবস্থিত একটি ভূমি। যাইহোক, এই গ্রন্থগুলি আমাদের এই অঞ্চলের কোন স্পষ্ট চিত্র প্রদান করতে পারেনি। মহাস্থানগড় (খণ্ডিত পাথরের) শিলালিপিটিকে মৌর্য আমলে রাজনৈতিক বিভাগ হিসেবে পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীনতম সুস্পষ্ট উল্লেখের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং অন্যান্য গ্রন্থের ভিত্তিতে পুণ্ড্রদের অঞ্চল উত্তরবঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। অধিকাংশ পণ্ডিত মহাস্থানগড়কে রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করেন। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। যেহেতু মৌর্যদের মহাস্থানগড় শিলালিপিতে পুণ্ডনগরের কথা উল্লেখ আছে, যা সংস্কৃত নথির পুণ্ড্রনগরের প্রাকৃত রূপ, তাই এটি মহাস্থানগড়ের সাথে পুণ্ড্রনগরের পরিচয় নিশ্চিত করে এবং নির্দেশ করে যে পুণ্ড্র অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করেছিল।

গুপ্ত যুগের পর থেকে আরও প্রত্নতাত্ত্বিক উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত আমলে মগধের সম্প্রসারণের ফলে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চলগুলির আঞ্চলিক সংগঠনে কিছু পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিল। সাম্রাজ্যিক গুপ্তদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল তা থেকে বাংলা এড়াতে পারেনি। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মেহেরোলির স্তম্ভলিপি, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ শিলালিপির বিষয়বস্তু গবেষকরা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে এই অঞ্চলটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন থেকে (৪৪৮ খ্রী:) পুণ্ডবর্ধনভুক্তি সম্পর্কে জানা যায়। এই প্রদেশটি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এর শাসককে স্বয়ং সম্রাট নিযুক্ত করতেন। প্রথম কুমারগুপ্তের পাহাড়পুর তাম্রশাসন (৪৭৯ খ্রী:) থেকে পুণ্ডবর্ধন এবং এর নগর-পরিষদ সম্পর্কে জানা যায়। দ্বিতীয় বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসনটি পুণ্ড্রবর্ধন প্রদেশের শাসক জয়দত্তকেও উল্লেখ করেছে। ৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দের আরেকটি গুপ্ত শিলালিপিতে পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাদেশিক শাসকদের দেবভট্টারক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ সম্রাটের পুত্র এবং প্রিয়। পাল-সেনের শিলালিপিতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে প্রচুর সংখ্যক প্রশাসনিক একক এবং উপ-এককের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রশাসনিক এককগুলির অনেকগুলি এখনও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গুপ্ত যুগের পাশাপাশি পাল-সেন যুগেও ভুক্তির আয়তন অনেক বড় ছিল। যদিও ভুক্তি সম্প্রসারণের কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে মনে হয় কার্যত সমগ্র বাংলা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল।

বাংলার শিলালিপিতে পুণ্ড্রবর্ধন নামটি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পৌন্ড্রবর্ধনে পরিবর্তিত হয়, যখন এটি মদনপালের মনহালি শিলালিপিতে প্রথম পাওয়া যায় এবং সেন শাসনের শেষ অবধি এটি প্রচলিত

ছিল। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে পুণ্ড্রবর্ধনকে গৌড়ের রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যা খ্রিস্টীয় ১১ শতকের পুরুষোত্তমের অভিধানেও উল্লিখিত। খ্রিস্টীয় ১২ শতকের তৃতীয় চতুর্থ পাদে, শাসক সেন রাজারা তাদের রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করায় পুণ্ড্রনগর শহর তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। খ্রিস্টীয় ১৩ শতকের শেষের দিকে বা খ্রিস্টীয় ১৪ শতকের শুরুতে পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চল মুসলিম আক্রমণকারীদের দখলে ছিল।

রাঢ় : প্রাচীন বাংলা অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল রাঢ়। রাঢ় অঞ্চল দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল যথা—দক্ষিণ রাঢ় এবং উত্তর রাঢ়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে এই অঞ্চলটি কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি, বর্ধমান-ভুক্তি, দণ্ড-ভুক্তি ইত্যাদির মতো কয়েকটি ছোট অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল—বজ্জভূমি ও শুভ্রভূমি।

রাঢ়-ভূমির দক্ষিণ অংশে বর্তমান হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর অংশে বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। চোল শিলালিপি উত্তর রাঢ় অঞ্চলকে উত্তরালাবম বলে উল্লেখ করেছে। বেলাভ এবং নৈহাটি অনুশাসন উত্তরাড়ের উল্লেখ করেছে এবং এটিকে বর্ধমান-ভুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে এটি কনকগ্রাম-ভুক্তির অংশ ছিল। দণ্ড-ভুক্তি ছিল একটি প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় অঞ্চল যা বর্তমানে বাঁকুড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিস্তৃত। এটি দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলের মধ্যে পড়েছিল। সাধারণত অজয় নদীকে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে সীমানা রেখা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিছু পণ্ডিত খারি নদীকে দুটি অংশের মধ্যে সীমানা রেখা হিসাবে গ্রহণ করতে পছন্দ করেন। জৈন সাক্ষ্যে কোটিবর্ষকে উত্তর রাঢ়ের একটি শহর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিতরা এই স্থানটিকে দিনাজপুর জেলার বানগড়ের সাথে চিহ্নিত করেছেন। এটি স্পষ্টভাবে বিভাগের উত্তর সীমা নির্দেশ করে।

মেদিনীপুরের তাম্রশাসন অনুসারে দক্ষিণ রাঢ়ের শশাঙ্কের দণ্ডভুক্তি একটি স্বাধীন সমান্ত রাষ্ট্র ছিল; মহারাজা সোমদত্ত এবং মহাপ্রতিহারগুভকীর্তি ছিলেন শশাঙ্কের অধীনস্থ শাসক। যদিও দিগ্বিজয়-প্রকাশ দামোদর নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ের এলাকাকে সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু লিপির উল্লেখগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে দক্ষিণের সীমানা রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত পৌঁছে থাকতে পারে এবং পশ্চিমের সীমা দামোদর নদী ছাড়িয়ে আরামবাগ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে উত্তর রাঢ় কনকগ্রাম-ভুক্তির সাথে সংযুক্ত ছিল। কোন অঞ্চল থেকে ভুক্তি নামটি এসেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিছু গবেষক রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গলকে প্রাচীন কনকগ্রামের আদি ভূমি বলে পরামর্শ দিয়েছেন। কোনো কোনো গবেষক এটিকে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের কাছে কোগ্রাম গ্রাম বলে চিনেন। অনেকে এই যুক্তি দিয়েছেন যে কনকগ্রামের ভুক্তি গৌড়ের পুরোনো রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে—বরাহমিহির, বাণভট্ট এবং হুয়েন সাং এর উল্লেখ করা কর্ণসুবর্ণ। কনকগ্রাম-ভুক্তি আরও অনেকগুলি প্রশাসনিক উপ-এককে বিভক্ত ছিল যাকে বলা হয় ভিথি। পাল সেন যুগে রাঢ় অঞ্চল বেশিরভাগই বর্ধমান-ভুক্তির অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাল সেনের সাক্ষ্যে বর্ধমান-ভুক্তির প্রধান উপ-বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে—দণ্ড-ভুক্তিমণ্ডল, পশ্চিমখটিকা, দক্ষিণরাঢ় এবং উত্তরাঢ়মণ্ডল। এভাবে সময়ে সময়ে রাঢ় অঞ্চলের ভূখণ্ড পরিবর্তিত হয়। ১৩ শতকের শেষের দিকে এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কয়েকটি মুসলিম শাসনের অধীনে চলে আসে।

২.৪ বঙ্গ

বঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ, যেখানে এটি অনার্যদের দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্য এবং ধর্মসূত্রে একাধিকবার বঙ্গের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুসারে বৈদিক আর্য সংস্কৃতির পরিধির বাইরে অবস্থিত বঙ্গ। কিন্তু মহাকাব্য রামায়ণে উল্লিখিত কিছু ঘটনা আর্য সংস্কৃতির মধ্যে বঙ্গ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা দেখায়। সাহিত্যিক সূত্র ছাড়াও এটি রাজা চন্দ্রের মেহরাউলি শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাতাপির চালুক্যদের তথ্য বৈদ্য দেবের কামায়ুলী তাম্রশাসন অনুশাসন এবং পাল রাজা ও সেন রাজাদের বিভিন্ন ভূদানের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি উৎস।

বঙ্গের জাতিগত নাম এবং একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক উপ-বিভাগ হিসাবে আলাদা করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ। একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন সাক্ষ্যের বঙ্গভূমি বর্তমান বাংলার ভৌগোলিক ভূখণ্ডের সমার্থক নয়। রঘুবংশমের দিগ্বিজয় বিভাগে কালিদাস এই অঞ্চলটিকে গঙ্গা নদীর প্রবাহের মধ্যে স্থাপন করেছেন। বঙ্গের পশ্চিম সীমানা সম্ভবত হুগলি পেরিয়ে মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী বা কাঁসাই (কাপিসা) নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিছু গবেষকের মতে যে পাল-সেন যুগে বঙ্গ উপ-অঞ্চল থেকে গঠিত হয়েছিল। বর্ধমান-ভুক্তি নামে গঠিত হয়েছিল। বঙ্গ অঞ্চলে তাম্রলিপ্তর অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। জৈন উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনের মতে, তাম্রলিপ্ত ছিল বঙ্গের একটি বন্দর শহর। কামায়ুলি তাম্রশাসন অনুশাসনে উল্লেখ আছে 'অনুত্তরভং'। পণ্ডিতরা এটিকে দক্ষিণ বঙ্গ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন যার অর্থ সেখানে বঙ্গকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—উত্তর এবং দক্ষিণ। এইচ. সি. রায়চৌধুরীর মতে, বৈদ্য দেবের অনুশাসন অনুযায়ী বঙ্গের দুটি ভাগ ছিল—বিক্রমপুর ভাগ এবং নব্য। পরবর্তীকালের সেন শিলালিপিতেও এর সমর্থন মেলে।

কিছু শিলালিপির সাক্ষ্যে আরেকটি শব্দও পাওয়া গেছে—"বাঙ্গালা" শব্দটি। বঙ্গ এবং বাঙ্গালা স্পষ্টতই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমালা শিলালিপি অনুসারে বাংলাদেশ তাক্কানালাদামের ঠিক পরে অবস্থিত ছিল যার অর্থ দক্ষিণ রাঢ়। এই সাক্ষ্যটি ব্যবহার করে আর. সি. মজুমদার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বাংলাদেশ বলতে দক্ষিণবঙ্গকে বোঝায় এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু গবেষকের মতে বঙ্গ এবং বাঙ্গালা বোঝানো হয়েছে দুটি পৃথক ভূমি। তাদের মতে বাঙ্গালা সম্ভবত চন্দ্রদ্বীপের সাথে সংযুক্ত ছিল যা প্রায়শই বরিশালের সাথে চিহ্নিত করা হত। এতে বর্তমান নোয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীর মতে, 'অন্যান্য জনপদের মতো, বঙ্গের আঞ্চলিক বিস্তার, রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে, কখনও কখনও এর সীমানা ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়, বা তার সীমার মধ্যে সংকুচিত হয়। যেমন, এর সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা খুব কমই সম্ভব। কিন্তু আমাদের হাতে থাকা উৎসগুলি আমাদের অনুমান করতে সক্ষম করে যে অন্তত এভাবে সময়ে সময়ে বঙ্গের ভৌগোলিক সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়। এর আগে এর আরও বর্ধিত অঞ্চল ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে আরও

ছোট প্রশাসনিক উপ-এককগুলির উত্থানের কারণে এটি তার কিছু অঞ্চল হারিয়েছে। ১৩ শতকের মধ্যে মুসলিম শাসকরা এই অঞ্চল জয় করে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

২.৫ গৌড়

গৌড় রাজ্যের উত্থান বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়রূপে চিহ্নিত। কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাস অতি প্রাচীন। পাণিনি তার ব্যাকরণ গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীতে গৌড়পুরের কথা উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে গৌড়দেশের সমৃদ্ধ পণ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। কামসূত্রের রচয়িতা বাৎস্যায়ন, কবি কালিদাস প্রমুখের লেখায় গৌড়ের উল্লেখ রয়েছে। বরাহমিহিরের মতে গৌড় বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা ছিল। ভবিষ্য-পুরাণ গৌড়কে বর্ধমানের উত্তর এবং পদ্মা নদীর দক্ষিণের মধ্যে অবস্থিত একটি অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করেছে। বরাহমিহির তার বৃহৎসংহিতায় গৌড়কে বিশেষ করে পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি, তাম্রলিপ্তিকা বা তাম্রলিপ্ত, বঙ্গসমতট এবং বর্ধমান-ভুক্তি থেকে আলাদা করেছেন। গুপ্তদের ক্ষয়িষ্ণু সময়ে গৌড় রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। শশাঙ্ক ছিলেন সবচেয়ে বিশিষ্ট শাসক যার শাসনকালে গৌড় তার শীর্ষে পৌঁছেছিল। এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে শশাঙ্ক বর্তমান মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে রাঙ্গামাটির কাছে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণে তার রাজধানী শহর স্থাপন করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর অধিকাংশ লেখক—গৌড়-কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুরারি রচিত অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকের কাব্য অনারঘরঘব চম্পাকে কর্ণসুবর্ণের পরিবর্তে গৌড়ের রাজধানী শহর বলে উল্লেখ করেছে। কিছু পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছিলেন যে চম্পা সম্ভবত বর্তমান বর্ধমান শহরের কাছে দামোদর নদীর বাম তীরে অবস্থিত চম্পা-নগরীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাল রাজাদের শাসনকালে গৌড় পাল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়। প্রথমে পাল শাসকরা সাধারণত বঙ্গপতি উপাধি লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট সাক্ষ্যে পাল রাজাদের গৌড়েশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত ধর্মপালের পরবর্তী রাজত্বকাল থেকে গৌড়েশ্বর উপাধিটি শাসক সম্রাটদের আনুষ্ঠানিক উপাধিতে পরিণত হয়। একটা সময় পর্যন্ত গৌড় ও বঙ্গ-র উল্লেখ থেকে বোঝা যায় এই দুটি পৃথক অঞ্চল ছিল। কিন্তু ক্রমশ গৌড় ও বঙ্গ সমার্থক শব্দে রূপান্তরিত হয়। খ্রিস্টীয় ১২ শতকের দিকে গৌড়রাষ্ট্রে রাঢ় এবং ভুরিশ্রেষ্ঠিকা (সম্ভবত হুগলি-হাওড়া জেলায় দামোদরের তীরে অবস্থিত ভুরশুট) অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়। ১৩ এবং ১৪ শতকের জৈন সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে গৌড় বর্তমান মালদা জেলার লক্ষ্মণাবতীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কখনও কখনও গৌড় শব্দটি খুব বর্ধিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চ-গৌড় অভিব্যক্তিটি গৌড়ের পাশাপাশি সারস্বত (পূর্ব পাঞ্জাব, কান্যকুব্জ, গাঙ্গেয় দোয়াব), মিথিলা (উত্তর বিহার) এবং উৎকল (উত্তর ওড়িশা) নামে পরিচিত দেশগুলিকে গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত রূপে ভাবা হয়েছে। প্রাথমিক মুসলিম শাসনকালে গৌড় মালদা জেলার লক্ষ্মণাবতীর সমার্থক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এটি তার গুরুত্ব হারায় এবং সুবে-বাংলার ভূখণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

২.৬ সমতট

সমতট অঞ্চলকে প্রায়ই বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালী অঞ্চলের সাথে চিহ্নিত করা হয়। তবে এই মতটিও সন্দেহের বাইরে নয়। Punch-marked coins বা ছাপাঙ্কিত মুদ্রা এবং উয়ারী-বটেশ্বর ধ্বংসাবশেষের মতো অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে সমতট মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের শিলালিপি এবং সাম্রাজ্য গুপ্ত শাসকদের পরবর্তী সাক্ষ্যে সমতটকে একটি করদ রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা সমতটকে বঙ্গ থেকে আলাদা করে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী উয়ারী-বটেশ্বরকে ট্রান্স-মেঘনা অঞ্চলের একটি অংশ বলে মনে করেন। তাঁর মতে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান সমতট অঞ্চলে। উয়ারী-বটেশ্বর এই অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। কিন্তু ঐতিহাসিকরা মনে করেন সমতট অঞ্চলটি ঐতিহাসিকভাবে আরও পুরোনো। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মহাজনপদের সময়কালে এই স্থানটির অস্তিত্ব ছিল। ওয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি সুরক্ষিত স্থান এবং প্রশাসনিক, উৎপাদন ও বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হত।

এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সময় বাংলার পূর্ব অংশ সমতট রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এ রাজ্যের কোনো শাসক সম্পর্কে সন্তোষজনক কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর এই অঞ্চলে দুটি স্বাধীন রাজবংশের বিকাশ ঘটে। এগুলি হল খড়্গ রাজবংশ। খড়্গ শাসকরা মূলত বঙ্গ অঞ্চলের বাসিন্দা। চিনা নথি অনুসারে খড়্গ শাসকরা তাদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন কারমান্তভাসাকে। এই শহরটিকে সাধারণত কুমিল্লা এবং ত্রিপুরার কাছে বাদকান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। এই রাজবংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন রাজাভট্ট। সমতট, বঙ্গ ও আরাকান অঞ্চলে চন্দ্র শাসকদের শাসন ছিল। তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। এর ফলে তাদের শাসনকালে সমতট বৌদ্ধ ধর্মের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ময়নামতি ছিল চন্দ্র শাসকদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের আগে পর্যন্ত সমতট বাংলার স্থানীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২.৭ ক্ষুদ্র উপ-বিভাগ

বাংলার ভূখণ্ডে উল্লিখিত পাঁচটি বিভাগ ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট উপ-বিভাগ বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিল। হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণবীথি ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। সপ্তম শতাব্দীর কিছু সাহিত্যে প্রায়ই হরিকেলকে একটি দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চিনা পরিব্রাজক আই-সিং এটিকে পূর্ব ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সর্বাধিক সীমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কর্পূরমঞ্জরী এবং আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প হরিকেলকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর মতে হরিকেল সম্ভবত সিলেটসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমার্থক।

২.৮ সারাংশ

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে বাংলাভাষী জনগণের অধ্যুষিত অঞ্চল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলার ভূ-রাজনৈতিক সীমা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। যে অঞ্চলটি আজ বাংলা নামে পরিচিত তা কয়েকটি একক এবং উপ-এককে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে গৌড়, বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, রাঢ় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এগুলি ছাড়াও হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বরেন্দ্র, সুবর্ণবীথি, বর্ধমান-ভুক্তি, কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি ইত্যাদির মতো অনেক ছোটখাটো বিভাগ ছিল। এটি প্রাচীন এবং আদি মধ্যযুগীয় সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উল্লেখ থেকে একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলের চিত্র স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়।

২.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন বাংলার উপ-অঞ্চলের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৩. প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপ-অঞ্চলগুলি কী কী? প্রাচীন বাংলার সমতট-হরিকেল অঞ্চল নিয়ে একটি টীকা লিখুন।

৪. রাঢ় এর উপর একটি ছোট টীকা লিখুন।

৫. বঙ্গের উপর একটি ছোট টীকা লিখুন।

৬. গৌড় সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

চক্রবর্তী, দিলীপ কে, *প্রাচীন বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯২।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *বাংলার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা, ১৯৮৫।

একক ৩ ❑ জনসংখ্যার কাঠামো

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ ভূমিকা

৩.২ জাতিসত্তা

৩.৩ জাতি গঠন

৩.৪ সারাংশ

৩.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৩.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- প্রাচীন বাংলার জনসংখ্যাগত কাঠামো বিশ্লেষণ করা।
- প্রাচীন বাংলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলোচনা করা।
- প্রাচীন বাংলার বর্ণ ব্যবস্থা ও বর্ণ ব্যবস্থার গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করা।

৩.১ ভূমিকা

বাংলা হল বাংলাভাষী লোকদের দেশ যারা সাধারণভাবে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মতো আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অঞ্চল সংজ্ঞায়িত করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ কারণ খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের বাংলা বলতে একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলকে বোঝাত না। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য ব্রিটিশশাসিত বাংলার ভৌগলিক সীমাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আধুনিক বাংলা আর প্রাচীন বাংলার সীমা ও জনসংখ্যার বিন্যাসে আদৌ এক ধরনের ছিল না। ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশ এবং বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল এক নয়। বাংলাভাষী জনগণের অধ্যুষিত অঞ্চলটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমানা বা এমনকি ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের বাইরেও বিস্তৃত। জাতিগতভাবে বাঙালিরা দক্ষিণ এশিয়ার বঙ্গীয়

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof \ (Dt. 18.03.2025)

অঞ্চলের একজন ইন্দো-আর্য আদিবাসী, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অংশে, বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকা রাজ্যগুলির মধ্যে বিভক্ত, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারের ভাষা। বাঙালিরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী। বাংলাদেশ এবং ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকা ছাড়াও বাঙালি-সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পাশাপাশি বর্তমান বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও বসবাস করে। অরুণাচল প্রদেশে, দিল্লি, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং উত্তরাখণ্ডে প্রভৃতি অঞ্চলেও বাংলাভাষী মানুষের বসতি রয়েছে।

৩.২ জাতিসত্তা

যদিও আজকাল আমরা সাধারণত বাংলার মানুষকে বাঙালি হিসেবে সাধারণীকরণ করি কিন্তু নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালিরা বিভিন্ন বর্ণ ও জাতিগত গোষ্ঠীতে বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী। বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বাংলা অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা বৈদিক আর্যদের থেকে জাতি ও সংস্কৃতিতে ভিন্ন ছিল। আদিম কাল থেকে বাংলায় বসতি স্থাপনকারী বিভিন্ন জাতিগুলির বিস্তারিত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। মোটামুটিভাবে বাংলার জনগণকে দুটি বিশিষ্ট উপাদানে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল এবং অন্যান্য আদিম উপজাতিদের সমন্বয়ে গঠিত জনসংখ্যা ; এবং অন্যটি উচ্চ শ্রেণির মানুষের সমন্বয়ে গঠিত যা বর্ণ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে আসে। প্রথম গোষ্ঠী হল বাংলার আদি বাসিন্দাদের প্রতিনিধি এবং তাদের অধিকাংশই সম্ভবত অনার্য লোকদের বংশধর ছিল যাদের বৈদিক সাহিত্যে নিষাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিকভাবে তারা 'অস্ট্রো এশিয়াটিক' বা 'অস্ট্রিক' মানুষ হিসেবে পরিচিত। এই আদিম মানুষগুলি বাংলার জনসংখ্যার স্তর তৈরি করেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে একটি উচ্চ সংস্কৃতি ও সভ্যতার নতুন তরঙ্গ এদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আদিম গোষ্ঠীটি তথাকথিত বাঙালি সমাজের বাইরের প্রান্তকে স্পর্শ করেছিল এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় গোষ্ঠীটি বাঙালি সমাজের ভিত নির্মাণ করে। এই দুই এর সংমিশ্রণে আধুনিক বাঙালিসমাজ গঠিত হয়েছে।

৩.৩ জাতি গঠন

উপমহাদেশে আর্যায়ন এবং বর্ণবিভাজন একটি থাকবন্দি সমাজ তৈরি করে। তাত্ত্বিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ করা হয়েছিল বিভিন্ন বর্ণের চরিত্র ও কর্মে প্রদর্শিত গুণাবলী ও উপাদানের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। উদাহরণ স্বরূপ, সত্ত্বের রক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণকে সর্বোত্তম বলে মনে করা হত। অন্য কথায় ও ব্রাহ্মণদের পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিশ্বাস করা হত। উল্লেখযোগ্যভাবে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের দ্বারা উপস্থাপিত গুণাবলী—যথা, রজ এবং তম-এর সাথে বিশুদ্ধতার মাত্রা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। শূদ্ররা, যারা

সামাজিক শৃঙ্খলার সর্বনিম্ন স্তরে অধিষ্ঠিত ছিল, তাদের মধ্যে কোন গুণ ছিল না বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত স্তবক, যাকে পরবর্তী ব্যাখ্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, চতুর্বর্ণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগের একটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ন্যায্যতা প্রদান করে। উপমহাদেশের আর্যায়নের ফলে ধীরে ধীরে বহিরাগতদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বর্ণের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে, বিশেষ করে যারা নিম্ন স্তরের অধিকারী। বর্ণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তীতে জাতি ব্যবস্থায় বিশদে বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, বর্ণ দ্বারা উপস্থাপিত শ্রমের বিস্তৃত, বিভাজন-ভিত্তিক জাতি ব্যবস্থায় অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিল, যার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পেশাগত পার্থক্য এবং আন্তঃসম্পর্কের একটি বিস্তৃত ব্যবস্থা তৈরি হয়।

বাংলায় আর্য সংস্কৃতির ক্রমান্বয়ে বিস্তারের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিশেষ পেশার সাথে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। চাষাবাদ, বাণিজ্য, কারিগর ও পেশাদার জাতি বর্ণের দিক থেকে শূদ্র হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষায়িত পেশাগত গোষ্ঠীর বিস্তার জাতিদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছিল, যা বর্ণের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, বিভিন্ন জাতির উপর দায়িত্ব থাকত বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য,—তা অবশ্যই পেশাগতভাবে। ফলশ্রুতিতে হিন্দু সমাজের কাঠামো বর্ণের বদলে জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়। এভাবে ধীরে ধীরে বর্ণ দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। বাংলার মতো অঞ্চলে যেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গোষ্ঠী ছিল না, এমনকি ব্রাহ্মণরাও জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল, যদিও তাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছিল।

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ, জাতি এবং পেশার মধ্যে সংযোগের উপর জোর দিয়ে, বর্ণপ্রথার প্রবক্তারা উৎপাদন ও বন্টনের একটি সম্পূর্ণ অ-প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল যা প্রতিটি ব্যক্তির জীবিকা নিশ্চিত করে এবং ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সপ্তম শতাব্দী থেকে ভারতের স্থানীয় অর্থনীতিতে বিরাজমান সীমিত সম্পদ এবং অভাব ও স্থবিরতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন ও বন্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল বর্ণপ্রথার জন্য। যাইহোক, ভারতের বিভিন্ন অংশে বর্ণপ্রথায় বৈচিত্র্য বিরাজমান ছিল। মজার ব্যাপার হল বর্ণপ্রথা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, বিশেষ করে স্মৃতি সাহিত্য থেকে, তা প্রাচীনকালে বাংলায় প্রচলিত সামাজিক অবস্থার সাথে পুরোপুরি মেলে না। এটা নিশ্চিত করা দরকার যে এই প্রাচীন স্মৃতিগুলির কোনোটিই বাংলায় রচিত হয়নি। তাই প্রাচীন স্মৃতি সাহিত্যের পাতা থেকে বর্ণের উপর ভিত্তি করে বাঙালি সমাজের ক্রমিক বিভাজন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক হবে না। যেমন কিছু পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছেন, একাদশ শতাব্দীর আগে বাংলায় রচিত কোনো স্মৃতি সাহিত্যই বাংলার সামাজিক দৃশ্যপটে আলোকপাত করতে পারেনি। তদুপরি, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে এটি কেবল অনুমান করা যেতে পারে যে একাদশ শতাব্দীর পর থেকে বাঙালি সামাজিক ভাষ্যের সংকলকরা সচেতনভাবে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণিবিন্যাসকে ব্রাহ্মণ্য

যুক্তির ভিত্তিকে গ্রহণ করেছিলেন। সেন-বর্মন শাসনকালে বাংলায় বেশ কিছু স্মৃতি ও অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ভবদেব ভট্ট এবং জীমুতবাহনের রচনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রকৃতপক্ষে, এই সাহিত্য গ্রন্থগুলিতে সমাজ ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে এবং বাংলার অতীতের ঐতিহাসিক আখ্যান নির্মাণের জন্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্মৃতি এবং অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থ ছাড়াও, পুরাণ এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ যেমন *ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ*, *বৃহধর্ম পুরাণ*। বাঙালি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। একই সময়ে, বংশানুক্রমিক গ্রন্থে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যও রয়েছে। একইভাবে বল্লালচরিত নামে দুটি গ্রন্থ রয়েছে। নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খানের নির্দেশে আনন্দ ভট্ট একটি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল। এই গ্রন্থটি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত হয়েছিল। যাইহোক, প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা করা হয়েছিল বল্লালসেনের নির্দেশে গোপাল ভট্টের দ্বারা, প্রায় ১৩০০ শকাব্দে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণপ্রথার যে চিত্র পাওয়া যায় তা বল্লালচরিত থেকে উঠে আসা চিত্র থেকে একেবারেই আলাদা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের আলাদাভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, এবং শূদ্রদের দুটি বিস্তৃত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—সৎ শূদ্র (যাদের থেকে উচ্চ বর্ণের লোকেরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারত) এবং অসৎ শূদ্র (যাদের স্পর্শ দূষণীয় বলে মনে করা হত।)। সামাজিক কাঠামোতে ব্রাহ্মণদের নিচে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এবং করণ (কায়স্থ)-দের অবস্থান। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের তলায় অবস্থান ছিল অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এবং করণদের (কায়স্থ)। একইভাবে, শাঁখারি, মোদক, তন্তুবায়ী, দাস (কৃষক), কর্মকার, সুবর্ণবণিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন উপ-জাতি এবং মিশ্র জাতি (শঙ্কর জাতি)ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের আখ্যানে স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে বল্লালচরিত একটি আখ্যান পেশ করেছেন, যা পুরাণ গ্রন্থের থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে বল্লালসেনের সময়ে, বাংলায় বর্ণপ্রথায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, বল্লালচরিতের রচয়িতাদের মতে, সুবর্ণবণিকদের অশুদ্ধ শূদ্রদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদের তাদের ধর্মীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এই একই সময়ে, বল্লালচরিতের ভাষ্য অনুযায়ী বণিক ও দাসদের প্রতিস্পর্ধী মনোভাবকে প্রশমিত করার জন্য, কৈবর্ত্যদের সৎশুদ্রতে উন্নীত করা হয়। অধিকন্তু, এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকাররাও সৎ শূদ্রদের পদে উন্নীত হয়েছিল। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে বলা দরকার যে, যদিও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে তাঁতী, গন্ধবণিক, কর্মকার, তৌলিকা (সুপারি ব্যবসায়ী), কুমার, শাঁখারি, কাঁসারী, বারুজীবী (বারুই), মোদক ও মালাকারদের উত্তম-শঙ্কর জাতি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। সুবর্ণবণিকদের (স্বর্ণকারদের) জল-অচল (যাদের থেকে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ বর্ণদের খাদ্য ও জল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল) জাতি, যেমন ধীবর এবং এর সাথে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল। বল্লালচরিত-এ ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু কারণের কথা বলা হয়েছে। এই দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের পরিবর্তন রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে ঘটেছে। একই সাথে, এটাও দৃঢ়ভাবে বলা দরকার যে, বল্লালচরিতের আখ্যানটি

ঐতিহাসিকদের কাছে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে, তবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বংশানুক্রমিক গ্রন্থের তুলনায় এটি অবশ্যই বেশি নির্ভরযোগ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলায় নিম্নবর্ণের কিছু বিবরণ তুলে ধরা যেতে পারে। পাল আমলের দলিল থেকে কৈবর্ত সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্য সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। কৈবর্ত প্রধান দিব্য বা দিব্যক পাল আমলে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি বেশ কিছু সামন্ত প্রভুর সাথে যোগসাজশে পাল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর, বাংলার কিছু অংশ দিব্য, রুদোক এবং ভীম নামে শক্তিশালী কৈবর্ত অধিপতিদের হাতে চলে যায়। এই ঐতিহাসিক বিকাশ কৈবর্তদের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে সামাজিক অবস্থানে পরিবর্তন আনতে পারে। পাল নথিগুলি অস্পৃশ্য জাতি সম্পর্কেও কিছু তথ্য প্রদান করে, যেগুলি হিন্দু সমাজের সীমানার বাইরে ছিল। পাল তাম্রশাসনে ভূমি অনুদানের সুবিধাভোগীদের নাম সম্বলিত তালিকায় পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, কৃষক ও সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু, এই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীগুলির বাইরে আরও কয়েকটি গোষ্ঠী ছিল যাদের মেধ, অন্ধ্র এবং চণ্ডাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। চণ্ডালদের সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বনিম্ন বলে মনে করা হত। ভবদেব ভট্টের মতো সামাজিক ভাষ্যকাররা তাদের অন্ত্যজ জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। বেশ কয়েকটি চর্যা গানে ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর এবং কাপালিকের মতো আরও কয়েকটি নিম্ন বর্ণের তথ্যও পাওয়া গেছে। কিছু মধ্যযুগীয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ধরনের নিম্নবর্ণের সাথে ব্রাহ্মণদের যোগাযোগ নিষিদ্ধ ছিল।

ভবদেব ভট্ট নিম্ন বর্ণের গোষ্ঠী যেমন চণ্ডাল, কাপালিক প্রভৃতিদের অস্পৃশ্য হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছিলেন। কাপালিকদের একটি অসভ্য সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হত, যারা উদ্ভট আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি অনুসরণ করত। শবররা, যারা বেশিরভাগই পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করত, তাদেরও নিম্ন বর্ণ হিসাবে গণ্য করা হত। যাইহোক, এটা কিছু নিশ্চিতভাবে তর্ক করা যেতে পারে যে তারা ডোম এবং চণ্ডালদের তুলনায় উচ্চ সামাজিক অবস্থান দখল করেছিল, যাদেরকে অন্ত্যজ জাতি হিসাবে গণ্য করা হত।

অন্ত্যজ জাতি বা অস্পৃশ্য গোষ্ঠীগুলি মূলত ব্যাধ/বানার, কাপালিক/কোল (আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্তর্গত), কঞ্চো (যাকে কোচ নামেও উল্লেখ করা হত এবং সাধারণত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণিবদ্ধ করা হত), হাড়ি, ডোম, বাগদি, শরকস, বলাগ্রহী এবং চণ্ডাল। অন্ত্যজ জাতিদের অধিকাংশই বর্ণাশ্রম প্রথার বাইরে থেকে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সমাজের সেবক হিসাবে বিবেচিত হত এবং তাই তাদের সর্বনিম্ন সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। চর্যাগীতি থেকে, বাংলার অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুসৃত পেশা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, তারা বেশিরভাগই বাঁশ থেকে তৈরি বিভিন্ন জিনিস করত। তাছাড়া গাছ কাটা, নৌকা চালানো, মদ তৈরি এবং শিকারে নিযুক্ত ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই অন্ত্যজ জাতিদের মধ্যে অনেকেই কালো জাদুর বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলন করেছে বলেও বিশ্বাস করা হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, হিন্দু সামাজিক মাপকাঠিতে অন্ত্যজ জাতিদের উন্নীত করার লক্ষ্যে দশম থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বাংলায় খুব কমই কোনো বড় সামাজিক আন্দোলন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাদের মধ্যে

সামাজিক গতিশীলতার খুব কমই ছিল, এবং মূলত নিম্নবর্ণের জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য সামাজিক গতিশীলতার প্রধান উৎসগুলি বন্ধ ছিল। বিকল্প কাজের সুযোগের অনুপস্থিতিতে প্রজন্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট পেশার দীর্ঘায়িত সাধনা স্বাভাবিকভাবেই কঠোর সামাজিক প্রথার জন্ম দেয়, যা ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা আবৃত ছিল। একইভাবে যদি সামাজিক গতিশীলতার উৎসগুলি নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে রুদ্ধ থাকে, তাহলে পেশাগত পরিবর্তনের সুযোগও থাকে না। অন্য কথায়, বর্ণের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রেও প্রায়শই সামাজিক অনমনীয়তা দেখা দেয়, যা নিম্ন বা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের ক্ষতি করে।

৩.৪ সারাংশ

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে আমরা বাংলার প্রাক্-আর্য জনসংখ্যার অধিকারী সভ্যতার মাত্রা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে খুব কমই জানি এবং সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণি বা বর্ণ কীভাবে সভ্যতার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তা বলা সম্ভব নয়। তবে এই ক্ষেত্রে আমরা বাংলার জন্য অনুমান করতে পারি যা সাধারণভাবে ভারতের বাকি অংশে গৃহীত হয়েছে। এখন সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ভারতের সভ্যতার ভিত্তি—কৃষির উপর ভিত্তি করে এর গ্রামীণ জীবন—নিষাদ বা অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল এবং এটি সম্ভবত বাংলার ক্ষেত্রেও সত্য ছিল।

৩.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন বাংলার সমাজ কাঠামো এবং বর্ণপ্রথার উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. প্রাচীন বাংলার জাতিসত্তা ও বর্ণপ্রথার উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৩.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

চক্রবর্তী, দিলীপ কে., *প্রাচীন বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯২।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

পর্যায়-২

শশাঙ্কের উত্থান পর্যন্ত বাংলার প্রাথমিক ইতিহাস

একক ৪ ❑ ধ্রুপদী সাহিত্যে বেঙ্গল : গঙ্গারিডাই

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ ভূমিকা

৪.২ ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যে বাংলা

৪.৩ গঙ্গারিডাই

৪.৪ গঙ্গারিডি সনাক্তকরণ সংক্রান্ত বিতর্ক

৪.৫ উয়ারী-বটেশ্বর ধ্বংসাবশেষ

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৪.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- সাহিত্যিক উপাদানে প্রাচীন বাংলার প্রতিফলন আলোচনা করা।
- দুটি প্রধান সাহিত্যিক উপাদান বিশ্লেষণ করা :
  - ধ্রুপদী ভারতীয় সাহিত্য
  - বিদেশি বিবরণ
- গঙ্গারিডির পরিচয় ও তার সম্ভাব্য ভৌগলিক অবস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত বিতর্ক শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

৪.১ ভূমিকা

বাংলা বিভিন্ন অংশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এর অনেক আদি ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এটি একটি বসতি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই ইতিহাস এখনও আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট

নয়। পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্য যেমন *ঐতেরয় আরণ্যক, ঐতেরয় ব্রাহ্মণ* ইত্যাদিতে বাংলা অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। মহাকাব্য ও ধর্মসূত্রেও এই অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব সাহিত্যের অধিকাংশই এই অঞ্চলটিকে অনার্যদের বসতি বা বৈদিক আর্যদের তুলনায় নিকৃষ্ট সংস্কৃতির লোকদের বলে উল্লেখ করেছে। শুধুমাত্র রামায়ণেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। এতে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাথে অভিজাত সম্পর্কের কিছু উল্লেখ রয়েছে। তবে খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর আগে রচিত প্রায় প্রতিটি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সাহিত্যে বাংলার জনগণের বিষয়ে একটি সাধারণ নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীকে সাধারণত ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়টি ছিল যখন ভারতীয় ইতিহাস প্রথমবারের মতো উৎসের দিক থেকে তার ঐতিহাসিকতা পেয়েছিল। ১৬টি মহাজনপদের উত্থান, বিশেষ করে মগধের উত্থান ভারতের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। মগধের উত্থান উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতে ক্ষমতা কেন্দ্রের স্থানান্তরকে চিহ্নিত করে। এভাবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই পূর্বাঞ্চল সাহিত্যে গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

৪.২ ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যে বাংলা

যদিও বাংলার আদিম ঐতিহাসিক বিবরণ এখনও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আঙিনায় তার শিকড় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, তবে প্রাথমিক ভারতীয় সাহিত্যের উৎসের পাশাপাশি বিদেশি বিবরণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য উৎস (প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ), বৌদ্ধ এবং জৈন উৎস এবং অন্যান্য সমসাময়িক সাহিত্যকর্ম প্রাচীন বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত চিত্র সরবরাহ করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঐতরেয় আরণ্যকই প্রথম ভারতীয় সাহিত্যকর্ম যেখানে বঙ্গের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে বাংলার ভূখণ্ডের ব্যাপক উল্লেখ রয়েছে। জৈন রচনাবলী যেমন আচারঙ্গ-সূত্র, উপাঙ্গ-সাহিত্য, বৌদ্ধ রচনা যেমন সমুত্তনিকায়, তেলাপত্তজাতক, মিলিন্দপানহোও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। সাধারণ সাহিত্য গ্রন্থ যেমন দশকুমার রচিত, পবনদূত ইত্যাদি বাংলার কথা উল্লেখ করে।

বিদেশি সাহিত্য সূত্রে বাংলা: প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য বিদেশি সাহিত্যের উৎসগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি সাহিত্যের উৎসগুলির গ্রেকো-রোমান, চিনা এবং আরব রচনাগুলি অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে পূর্ব ভারতে যে ভৌগলিক পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল তা বোঝার জন্য গ্রীক বিবরণগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রীক সূত্র অনুসারে, আধুনিক উত্তর-পূর্ব ভারত এবং হিমালয়ের পাদদেশে সেই সময়ে কিরাতদের বসবাস ছিল। অতএব, সূত্রগুলি অনুসারে বলা যায় যে পুণ্ড্র এবং কিরাত অঞ্চলগুলি সীমান্তবর্তী বা সংলগ্ন ছিল। এটি সম্ভবত এই অনুমানকে সমর্থন করে যে বৃহত্তর অঞ্চলটি আগে

কিরাত নামে পরিচিত ছিল এবং কিরাত ভূখণ্ডের একটি অংশ পরবর্তীকালে পুণ্ড্র নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পুণ্ড্র নামটি প্রাথমিক চিনা বিবরণগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা এটিকে বাংলার উত্তর অংশে অবস্থিত একটি অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করেছে। চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং এবং আই-সিং-এর বর্ণনা অনুসারে করতোয়া নদী পুণ্ড্রবর্ধন ও প্রাগজ্যোতিষপুর-কামরূপের মধ্যে সীমানা তৈরি করেছিল। সেই সময় পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটছিল—যেমন ফা-হিয়েন ব্যাখ্যা করেছিলেন। হিউয়েন-সাং তার লেখায় পুণ্ড্রবর্ধনকে পুন-না-ফ্যান্তান-না বলে উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাং এর বক্তব্য অনুযায়ী যে গুপ্ত যুগ থেকে ধীরে ধীরে পুণ্ড্রবর্ধন একটি ভুক্তি হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। হিউয়েন-সাং-এর ব্যাখ্যায় কজঙ্গাল এবং করতোয়া নদীর মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের অবস্থান নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪.৩ গঙ্গারিডাই

গঙ্গারিডাই গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখায় একটি জনগণের এবং একটি দেশের নাম হিসাবে পাওয়া যায়, যার তারিখগুলি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। গঙ্গারিডাই শব্দটি এবং এর রূপগুলি Gangaridae, Gangaridum এবং Gangarides প্রাচীন লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডার এবং তার সৈন্যদের প্রাপ্ত ধারণার ভিত্তিতে সিন্ধু নদীর ওপারের দেশগুলি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে, ডিওডোরাস (৬৯ খ্রিস্টপূর্ব—১৬ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গার ওপারে প্রসিওই এবং গঙ্গারিডাইয়ের বসতি ছিল। কুইন্টাস কার্টিয়াস রুফাস আমাদের বলেছেন যে গঙ্গারিডাই এবং প্রসিওই—এই দুধরনের জনগোষ্ঠীর বসতি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল। প্লিনি (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) লিখেছেন যে গঙ্গার শেষ অংশটি গঙ্গারাইডদের দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। ভার্জিল (আনুমানিক ৩০ খ্রিস্টপূর্ব) গঙ্গারিডাই এর অবস্থান উল্লেখ করেছেন কিন্তু ভৌগলিক অবস্থান নিয়ে কিছু বলেননি।

গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থেনিসের (৩৫০-২৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) লিখিত রচনায় গঙ্গারিডাই-এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ৬০ এবং ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে লিপিবদ্ধ গ্রীক ইতিহাসবিদ ডিওডোরাস সিকুলাসের লেখায়, গঙ্গারিডাই জাতির উল্লেখ রয়েছে : যাকে তিনি "একটি জাতি যার সর্বাধিক সংখ্যক হাতি রয়েছে এবং আকারে সবচেয়ে বড়।" ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট প্রসিওই এবং গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্যের যৌথ আক্রমণের আশঙ্কায় এই অঞ্চল ছেড়েছিলেন। এই অঞ্চলে আক্রমণ এবং পরবর্তীকালে আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তনের সম্পর্কে গ্রীক এবং রোমান ঐতিহাসিকদের আরও অনেক লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত মেগাস্থিনিস গঙ্গারাইডস হিসাবে উল্লেখ করা লোকদের সম্পদ এবং শক্তি সম্পর্কেও লিখেছেন, উল্লেখ করেছেন যে তাদের রাজার ১,০০০ ঘোড়া, ৭০০ হাতি এবং ৬০,০০০ সৈন্য ছিল। নন্দ রাজবংশের শেষ শাসক ধননন্দ, আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় গঙ্গারিডাই অঞ্চলের রাজা ছিলেন। নন্দ রাজবংশ ছিল প্রসিওই এবং গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্যের একটি সংমিশ্রণ। ধননন্দকে পরবর্তীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত করা হয়। মৌর্যরা ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত

শাসন করেছিল। প্রখ্যাত বাঙালি ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে গঙ্গারিডাই রাজ্য স্বাধীন ছিল।

গঙ্গারিডাই-এর প্রাচীনতম (টিকে থাকা) বর্ণনা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর লেখক ডায়োডোরাস সিকুলাসের বিবলিওথেকা হিস্টোরিকায় পাওয়া যায়। এই বিবরণটি এখন হারিয়ে যাওয়া একটি কাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, সম্ভবত মেগাস্থেনিস বা কার্ডিয়ার হিয়ারনিমাসের লেখা।

Bibliotheca History এর বই ২-এ, Diodorus বলেছেন যে "Gandaridae" (অর্থাৎ Gangaridai) অঞ্চলটি গঙ্গা নদীর পূর্বে অবস্থিত ছিল, যা ৩০টি স্টেড প্রশস্ত ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কোন বিদেশি শত্রু কখনও গঙ্গারিডাই জয় করতে পারেনি, তার শক্তিশালী হস্তিবাহিনীর জন্য। তিনি আরও বলেছেন যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট অন্যান্য ভারতীয়দের বশীভূত করার পরে গঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি যখন শুনলেন যে ডিওডোরাসের মতে ৪,০০০টি হাতি রয়েছে তখন তিনি পিছু হটানোর সিদ্ধান্ত নেন। আলেকজান্ডারকে পিছু হটতে হয়েছিল যখন তার সৈন্যরা গঙ্গারিডাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান করতে অস্বীকার করেছিল। বিবলিওথেকা ঐতিহাসিকের ১৮নং বইতে, ডিওডোরাস ভারতকে বেশ কয়েকটি সমন্বিত একটি বৃহৎ রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। জাতি, যার মধ্যে বৃহত্তম ছিল "Tyndaridae" (যা "Gandaridae"-র অপভ্রংশ একটি)। তিনি আরও বলেন যে একটি নদী এই জাতিকে তাদের প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে আলাদা করেছে; এই ৩০-স্টাডিয়া প্রশস্ত নদীটি ছিল ভারতের এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী (ডিওডোরাস এই বইতে নদীর নাম উল্লেখ করেননি)। তিনি উল্লেখ করেছেন যে আলেকজান্ডার এই জাতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাননি, কারণ তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে হাতি ছিল। ডায়োডোরাসের লেখার ভিত্তি হল মেগাস্থেনিসের ইন্ডিকা। মেগাস্থেনিসের ইন্ডিকা এখন হারিয়ে গেছে, যদিও এটি ডিওডোরাস এবং পরবর্তী অন্যান্য লেখকদের লেখা থেকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। জে. ডব্লিউ. ম্যাকক্রিন্ডল (১৮৭৭) এর মতে ডায়োডোরাসের লেখার উৎস ইন্ডিকা। যাইহোক, A. B. Bosworth (১৯৯৬) এর মতে, গঙ্গারিডাই সম্পর্কে তথ্যের জন্য ডায়োডোরাসের উৎস ছিলেন কার্ডিয়ো (৩৫৪-২৫০ BCE), যিনি আলেকজান্ডারের সমসাময়িক ছিলেন এবং ডিওডোরাসের বইয়ের তথ্যের প্রধান উৎস ছিলেন।

টলেমি (২য় শতাব্দী) তার ভূগোল গ্রন্থে বলেছেন যে গঙ্গারিডি "গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল" দখল করেছিল। তিনি তাদের রাজধানী হিসাবে গঙ্গে নামে একটি শহরের নামকরণ করেন। এটি থেকে বোঝা যায় যে গঙ্গা ছিল একটি শহরের নাম, নদীর নাম থেকে উদ্ভূত। শহরের নামের উপর ভিত্তি করে, গ্রীক লেখকরা স্থানীয় লোকদের বর্ণনা করার জন্য "গঙ্গারিডাই" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইরিথ্রিয়ান সাগরের পেরিপ্লাস গঙ্গারিডাইয়ের উল্লেখ করেনি, তবে "গঙ্গা" হিসাবে বর্ণনা করা একটি শহরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে। Dionysius Periegetes (CE 2nd-3rd শতাব্দী) "Gargaridae" উল্লেখ করেছেন যেটি "সোনা বহনকারী হাইপানিস" নদীর কাছে অবস্থিত। হাইপানিস নদী সম্ভবত বিয়াস নদীর সাথে চিহ্নিত।

"Gargaridae" কখনও কখনও "Gangaridae" এর একটি রূপ বলে মনে করা হয়, কিন্তু অন্য একটি তত্ত্ব গান্ধারের মানুষদের সাথে এটিকে চিহ্নিত করে। এ.বি.বসওয়ার্থ ডায়োনিসিয়াসের বিবরণকে "অবিবেচনা প্রসূত" বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, উল্লেখ করেছেন যে তিনি হাইপানিস নদীকে গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রবাহিত বলে ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রীক পুরাণেও গঙ্গারিডাই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রোডসের আরগোনাউটিকার অ্যাপোলোনিয়াসে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী), ডাটিস, একজন সর্দার, গঙ্গারিডির নেতা যিনি তৃতীয় পার্সেস এর সেনাবাহিনীতে ছিলেন, কলচিয়ান গৃহযুদ্ধের সময় আইটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

৪.৪ গঙ্গারিডি সনাক্তকরণ সংক্রান্ত বিতর্ক

গঙ্গারিডি অঞ্চলের পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নন। Gangaridai বা Gangaridae গ্রীক এবং ল্যাটিন রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এবং শব্দটি আসলে একটি ভৌগলিক অঞ্চল বা সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ বা সম্ভবত উভয়কেই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটা স্পষ্ট যে এই শব্দটি গঙ্গা বা গঙ্গা নদীকে নির্দেশ করে এবং এটি ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির একটি অঞ্চল বা ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমিতে বসবাসকারী লোকদের বর্ণনা করে। কিন্তু গঙ্গার গতিপথ, হিমালয়ে এর উৎপত্তি থেকে শুরু করে উপমহাদেশে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ পর্যন্ত ভ্রমণ, যেখানে এটি সমুদ্রে মেশে, এত বিশাল যে এর সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা বা চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রাচীন গ্রীক লেখকরা Gandaridae উল্লেখ করেছেন এবং রোমানরা যারা পরে এসেছেন তারা Gangaridae উল্লেখ করেছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু গ্রীক লেখক অ্যাগ্রামেস বা Xandrames কে বিয়াস নদীর ওপারের জনগণের একজন শক্তিশালী রাজা হিসাবে অভিহিত করেছেন : "গঙ্গারিডে এবং প্রসিওই", যার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। মেগাস্থেনিসের বর্ণনা অনুসারে, গঙ্গারিডি হ'ল গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপ দখলকারী লোকেরা, যা মগধে নয় বরং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে অবস্থান। প্রসিওইরা ছিল মধ্যদেশের (মধ্য দেশ) পূর্বে বসবাসকারী প্রাচ্য বা পূর্ববাসী ; এরা ছিল পঞ্চাল, শুরসেন, কোশল, কাশী এবং বিদেহবাসী। আলেকজান্ডার আক্রমণ করার সময় পোরাস (Porus the Youngerz) অ্যাগ্রামেস রাজ্যে পালিয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

প্রতাপ বর্মনের মতে, রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন ভূমিকে মন্দাচল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মন্দাচলের বাসিন্দাদের রাক্ষস বা মান্দাই হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দাচলের শহরগুলি সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত ছিল, এমনকি মাছকেও সোনালি রঙে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই কারণেই ইতিহাসের পরবর্তী অংশে সারা বিশ্বের ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্য ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। গ্রীক লেখকরা মান্দাই জনগণের ভূমিকে গঙ্গারিডাই নামে অভিহিত করেছেন। টলেমি ১০০ খ্রিস্টাব্দে তার মানচিত্রে গঙ্গারিডাই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মান্দাইবাসীরা নদীটিকে গাঙ নামক ডাকে এবং গঙ্গা নদীর পূর্ব দিকের মান্দাই জনগণের জমিকে গঙ্গারিডাই নামে অভিহিত করা হয়। নদীর তীরে বা গঙ্গা নদীর

সমভূমিতে বসবাসকারী মান্দাইরা কলিঙ্গ নামে পরিচিত এবং পাহাড়ে বসবাসকারীরা মান্দাই নামে পরিচিত ছিল। মান্দাই জনগণের পূর্বে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল, যার জন্য আলেকজান্ডারকে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং বিশ্ব জয়ের আশা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মান্দাই জনগণকে দৈত্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রাচীন ধর্মীয় লেখায় রাক্ষস, দানব, অসুর প্রভৃতি। A. B. Bosworth উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীন ল্যাটিন লেখকরা প্রায় সবসময়ই "Gangaridae" শব্দটি ব্যবহার করেছেন জনগোষ্ঠীকে সংজ্ঞায়িত করতে এবং তাদের প্রসি মানুষের সাথে যুক্ত করতে। মেগাস্থিনিসের মতে, (যিনি আসলে ভারতে এসেছিলেন) প্রসিওই লোকেরা গঙ্গার কাছে বাস করত। এছাড়াও, প্লিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গারিডি গঙ্গার পাশে বাস করত, তাদের রাজধানীর নাম পের্টালিস। এই সমস্ত প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে গঙ্গারিডি গাঙ্গেয় সমভূমিতে বাস করত। ডিওডোরাস বলেছেন গঙ্গা নদী গঙ্গারিডাইয়ের পূর্ব সীমানা তৈরি করেছে। ডিওডোরাসের লেখা এবং গঙ্গার পশ্চিম শাখা ভাগীরথী-হুগলির সাথে গঙ্গার পরিচয়ের ভিত্তিতে, গঙ্গারিডাইকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের সাথে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্লুটার্ক, কার্টিয়াস এবং সোলিনাস-এর মতে যে গঙ্গারাইডি গঙ্গারিডাই নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেছিলেন যে ডিওডোরাসের মতো পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ পদ্মা নদীর জন্য গঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। প্লিনি গঙ্গা নদীর পাঁচটি মুখের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে গঙ্গারিডাই এই সমগ্র অঞ্চল দখল করেছিল। তিনি গঙ্গার পাঁচটি মুখের নাম দিয়েছেন কাম্বিসন, মেগা, কাম্বেরিকন, সিউডোস্টোমন এবং এন্টেবোল। নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার কারণে এই মুখগুলির এই সঠিক বর্তমান অবস্থানগুলি নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় না। ডি. সি. সরকারের মতে, এই মুখগুলিকে ঘিরে থাকা অঞ্চলটি পশ্চিমে ভাগীরথী-হুগলী নদী এবং পূর্বে পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে মনে হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে গঙ্গারিডাই অঞ্চলটি পূর্বে পদ্মা নদী পর্যন্ত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করে। গৌরীশঙ্কর দে এবং শুভ্রদীপ দে মনে করেন যে পাঁচটি মুখ বঙ্গোপসাগরের প্রবেশদ্বারে বিদ্যাধরী, যমুনা এবং ভাগীরথী-হুগলির অন্যান্য শাখাকে নির্দেশ করতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর মতে, গঙ্গারিডাই শক্তির কেন্দ্র ছিল আদি গঙ্গা (এখন হুগলি নদীর একটি শুকিয়ে যাওয়া প্রবাহ) এর কাছাকাছি। তিনি চন্দ্রকেতুগড়কে সবচেয়ে শক্তিশালী এলাকা রূপে হিসেবে বিবেচনা করেন, এরপর মন্দিরতলা। জেমস ওয়াইজ বিশ্বাস করতেন যে বর্তমান বাংলাদেশের কোটালীপাড়া ছিল গঙ্গারিডাইয়ের রাজধানী। প্রত্নতাত্ত্বিক হাবিবুল্লাহ পাঠান উয়ারী-বটেশ্বর ধ্বংসাবশেষকে গঙ্গারিডাই অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৪.৫ উয়ারী-বটেশ্বর ধ্বংসাবশেষ

উয়ারী-বটেশ্বর বর্তমান বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। অধিকাংশ পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে এই স্থানটি গ্রেকো-ল্যাটিন সূত্রে উল্লিখিত গঙ্গারিডাই অঞ্চলের সাথে যুক্ত। বাংলাদেশের

নরসিংদী জেলার বেলাবো থানার অন্তর্গত আমলাবো ইউনিয়নের দুটি সংলগ্ন গ্রাম ওয়ারী ও বটেশ্বর। এটি মনোহরদী-শিবপুরে প্লাইস্টোসিন সোপানের একটি বিচ্ছিন্ন অংশে অবস্থিত, যা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং লক্ষ্য নদী দ্বারা মধুপুর এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে, উয়ারী-বটেশ্বরের বিপুল সংখ্যক সাংস্কৃতিক উপকরণ খনন থেকে পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটিতে নিয়মানুগ প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা হয়েছিল ১৯৯৮-৯৯ সালে। ২০০০ সালেও এখানে খনন কার্য করা হয়। উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে এটা স্পষ্ট যে মধ্যে মধ্যে বিরতি বা ছেদ থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে এখানে বসতি ছিল। অনুসন্ধান ও খননের ফলে উয়ারী-বটেশ্বরে একটি দুই হাজার পাঁচশ বছরের পুরানো দুর্গ-নগরী আবিষ্কৃত হয়েছে। ৬০০m × ৬০০m এর সুরক্ষিত ঘেরে, চারটি মাটির প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীন প্রাচীরের অধিকাংশ অংশ ধ্বংস হয়ে গেলেও কিছু জায়গায় এখনও ৫-৭ ফুট উচ্চতার দেয়ালের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীরগুলি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত, যা সময়ের সাথে সাথে পলি হয়ে ধানক্ষেতে পরিণত হয়েছে। ওয়ারী-বটেশ্বর দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, আসাম রাজার গড় নামে পরিচিত। একটি ৫.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ, ২০ মিটার চওড়া এবং ১০ মিটার উঁচু মাটির প্রাচীর রয়েছে। সম্ভবত এটি ওয়ারী-বটেশ্বর দুর্গ-শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল যা দ্বিতীয় দুর্গ প্রাচীর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

উয়ারী-বটেশ্বরের আদি বাসিন্দারা উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাথে পরিচিত ছিল। পাথর কেটে তারা পুঁতি তৈরি করতে পারত। খননের সময় আধা-মূল্যবান পাথরের গুটিকা তৈরির কাঁচামাল, ছোট ছোট পাথরের টুকরো আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করে তারা পুঁতি সাজাতে পারত। তারা বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করে উত্তর-ভারতীয় কালো পালিশ করা পাত্রে প্রলেপ দিতে পারত। মৃৎপাত্র তৈরির সময় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা ধাতু গলিয়ে মুদ্রা তৈরির কৌশল জানতেন। তাদের লোহা প্রক্রিয়াকরণের জ্ঞান ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর দুর্গ-নগরী এবং আসাম রাজার গড়ের অবস্থান প্রমাণ করে যে, এখানকার অধিবাসীরা জ্যামিতিক জ্ঞানে পারদর্শী ছিল। এই কারণগুলি প্রাচীন বাসিন্দাদের প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি নির্দেশ করে পাশাপাশি স্পষ্টতই তাদের শৈল্পিক বোধ, সৌন্দর্যের আরাধনা এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কাজে দক্ষতা নির্দেশ করে। নর্দার্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যারের সাথে শহুরে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উপমহাদেশের দ্বিতীয় নগরায়ণের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলিতে সাধারণত উত্তরের কালো পালিশ করা জিনিসপত্র পাওয়া যায়। বলা হয় যে দ্বিতীয় নগরায়ণের শাসক ও ব্যবসায়ীদের ব্যবহারিক চাহিদা মেটাতে এই উত্তরাঞ্চলীয় কালো পালিশ করা জিনিসপত্র তৈরি করা হয়েছিল। এই অঞ্চলে কোয়ার্টজ, কাম্পার, কার্নেলিয়ান প্রভৃতি পাথরের তৈরি অলঙ্কার, মালা প্রভৃতি এই স্থানে খননের ফলে পাওয়া গিয়েছে। এটি অনুমান করা হয় যে উয়ারী-বটেশ্বর একটি নদীবন্দর এবং একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। দিলীপ কুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন যে উয়ারী-বটেশ্বর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হতে পারে যা টলেমি উল্লেখ করেছিলেন। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর উপর ভিত্তি করে, আমরাও একমত যে উয়ারী-বটেশ্বর ও সৌয়ানগৌর অভিন্ন ছিল।

৪.৬ সারাংশ

সুতরাং উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, যদিও গঙ্গারিডাই অঞ্চলের অবস্থান এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, তবে নিঃসন্দেহে এটি প্রাচীনকালের একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বসতি ছিল। প্রসিওই রাজ্য এবং গঙ্গারিডির মধ্যে সম্পর্কও স্পষ্ট নয়। এটা প্রশংসনীয় যে আলেকজান্ডারের আক্রমণের হুমকি মোকাবিলায় গঙ্গারিডে প্রাসিওই-এর সাথে একটি কনফেডারেসি গঠন করেছিল। ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে, এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখকদের বক্তব্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময়, গঙ্গারিডাই একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি ছিল এবং হয় প্রসিওইদের সাথে একটি দ্বৈত রাজতন্ত্র গঠন করেছিল, অথবা বিদেশি আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন কারণে সমান শর্তে তাদের সাথে সম্পর্কিত জড়িত ছিল।

৪.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন বাংলার গঙ্গারিডাই সভ্যতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৪.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতীশ, *ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

মজুমদার, আর সি (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

একক ৫(ক) ❑ গুপ্ত শাসনের আগে বাংলা

গঠন

৫(ক).০ উদ্দেশ্য

৫(ক).১ ভূমিকা

৫(ক).২ কুষাণ শাসনকালে বাংলা

৫(ক).৩ বাংলায় গুপ্ত শাসন

৫(ক).৪ সাম্রাজ্যিক গুপ্ত শাসকদের অধীনে প্রশাসন

৫(ক).৫ গুপ্ত আমলে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যকরণ

৫(ক).৬ সারাংশ

৫(ক).৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৫(ক).৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৫(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- প্রাক্-গুপ্ত ও গুপ্ত যুগে বাংলার ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করা।
- কুষাণ যুগে বাংলার ইতিহাস ব্যাখ্যা করা।
- গুপ্ত যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করা হবে।
- দুটি মূল বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচিত হবে :
  - ☞ বাংলায় গুপ্ত প্রশাসন
  - ☞ বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিকাশ

৫(ক).১ ভূমিকা

মৌর্য-পরবর্তী সময়ে বর্তমান বাংলা অঞ্চলের অবস্থা আমাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। সাহিত্যিক প্রমাণ এবং মুদ্রাবিজ্ঞান সময়ের একটি বিচ্ছিন্ন পর্যায় নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের

পতনের ফলে খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতে সামগ্রিকভাবে খণ্ডিত অবস্থা দেখা দেয়।

৫(ক).২ কুষাণ শাসনকালে বাংলা

খিস্টীয় ১ম শতাব্দীতে কুষাণ সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। এটি পূর্বে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিছু গবেষকের মতে যে কনিষ্ক প্রথম সম্ভবত বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। এটি উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই অনুমানের পক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ নেই। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই মতটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বিহার, বাংলা ও ওড়িশার বেশ কিছু জায়গায় কুষাণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনো কোনো গবেষক এই সমগ্র অঞ্চলে কুষাণ রাজাদের আধিপত্যের পক্ষে যুক্তি দেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক এই যুক্তির বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল এই মুদ্রাগুলি বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলায় পৌঁছেছিল।

সংখ্যাগত প্রমাণ ব্যতীত, বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে কুষাণ সাংস্কৃতিক পর্বের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই মৃৎশিল্প সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হল লাল রঙের পালিশ করা পাত্র। পাত্রগুলির উপর রয়েছে বিচিত্র ছাপযুক্ত কারুকাজ। মঙ্গলকোট, চন্দ্রকেতুগড়, পাখান্না (পোখরনা), ক্লাইভ হাউস, তমলুক, দেউলপোতা, নাটসাল, তিলপি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলি প্রভৃতি থেকে উপরোক্ত মৃৎপাত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে যা কুষাণ যুগের। এই লাল পাত্র ব্যতীত, কুষাণ নৈপুণ্যের সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যসূচক ধরনের হল রুলেটের পাত্র। এটি একটি ধূসর মৃৎপাত্রের থালা যার ব্যাস ২৪-৩৩ সেন্টিমিটার। বাঁকানো এবং এটি প্রান্তবিশিষ্ট বা বেড়বিশিষ্ট। এতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকৃতি যেমন ত্রিভুজ, কীলক, বিন্দু ইত্যাদির সজ্জা থাকে। এই ধরনের মৃৎপাত্র সাধারণত চাকার তৈরি, স্লিপড এবং মসৃণ পৃষ্ঠ থাকে। কুষাণ সাংস্কৃতিক পর্বের রুলেট সামগ্রী পরবর্তীকালে বাংলার অসংখ্য স্থানে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় রুলেট মৃৎপাত্রকে রঙ, পোড়ানোর পার্থক্য প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে দুটি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথমটির গাঢ় বাদামী বা কালো পৃষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টির অভ্যন্তরভাগ ধূসর বা লালচে বাহ্যিক। দুটি ধরনই পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে। কুষাণ সাংস্কৃতিক পর্ব সহ বাংলার প্রায় সমস্ত প্রাথমিক ঐতিহাসিক স্থানগুলি রুলেটের পাত্রের সন্ধান মিলেছে। মহাস্থানগড়, ওয়ারী-বটেশ্বর, তমলুক, তিলপি, নাটসাল থেকে প্রচুর পরিমাণে রুলেটের পাত্র আবিষ্কার করেছে। তবে এটা মনে রাখা উচিত যে কুষাণ রুলেট ওয়্যারের আরিকামেডু ধাঁচ বাংলা ধাঁচের থেকে আলাদা ছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে চন্দ্রকেতুগড়-তমলুক অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলের সাথে নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে একাধিক উৎপাদন কেন্দ্রে রুলেটের জিনিসপত্র তৈরি করা হত, যদিও চন্দ্রকেতুগড়-তমলুক ছিল মূল কেন্দ্র।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন যে বাংলা সামগ্রিকভাবে কুষান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। কিন্তু

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক প্রমাণ এবং সেইসাথে প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দীতে বাংলার সামগ্রিক সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রধানত বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। মৌর্য-উত্তর ও গুপ্ত-পূর্ব যুগে তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড় নামে অন্তত দুটি বড় বন্দর ছিল। উর্বর জমি, বর্ধিত খাদ্য সরবরাহ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ইত্যাদি প্রাচীন বাংলায় শহর ও শহরগুলির বৃদ্ধির পটভূমি প্রদান করে এবং ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক শহর গড়ে ওঠে। কৃষি উদ্বৃত্ত, কারুশিল্পের প্রসার এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণ দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি খ্রিস্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে নাগরিক বৃদ্ধির দ্রুত হারের জন্য পথ প্রশস্ত করেছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান থেকে আবিষ্কৃত খরোষ্ঠী এবং খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী শিলালিপির বিস্তৃত অধ্যয়নের পর বি এন মুখার্জী পরামর্শ দেন যে এই শিলালিপিগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে প্রাচীন বঙ্গের সমৃদ্ধি কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিহিত ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে আবার অবস্থার পরিবর্তন হয়। আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থা খুব একটা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এই রাজ্যগুলির গুপ্তযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে বৈশিষ্ট্য ছিল নদী এবং জলাভূমির প্রাকৃতিক অনম্যতার মধ্যে তারা বিকশিত হয়।

৫(ক).৩ বাংলায় গুপ্ত শাসন

বাংলায় গুপ্ত শাসনকে প্রায়শই এমন একটি পর্যায় হিসাবে দেখা হচ্ছে যা বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন পর্যায় সৃষ্টি করেছিল, এর আগে বাংলা মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার একটি প্রান্তীয় অঞ্চল হিসাবে ছিল। মগধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সামগ্রিকভাবে উত্তর ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার সমাপ্তি নির্দেশ করে। বাংলার ভূখণ্ডও এর ব্যতিক্রম ছিল না। গুপ্ত শাসকদের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটায়। বাংলা ঠিক কবে গুপ্ত শাসকদের অধীন হয়েছিল তা নির্ধারণ করা সত্যিই কঠিন কাজ। কিছু গবেষকের মতে এটি সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে হয়েছিল, অন্যরা তার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে যুক্তি দেয়। নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে খ্রিস্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা উপজাতীয়, সামাজিক স্বতন্ত্রতা থেকে বেরিয়ে আসছে। এবং রাজনৈতিক কাঠামো বিকশিত হচ্ছে। এই সময় রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বসতির জাতিগত নাম স্থান নামে (জনপদ) পরিচিত হতে থাকে। ধর্মের মতো জীবনের অন্যান্য দিকগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। সামগ্রিকভাবে তিনি লক্ষ্য করেন যে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল উত্তর ভারতের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মতাদর্শের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। যদিও গুপ্তদের বাংলা বিজয়ের প্রকৃত প্রক্রিয়া আমাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে সন্দেহ নেই যে প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি নামে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। এটি সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত একজন প্রাদেশিক

গভর্নরের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসক, প্রদেশকে বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রশাসনিক উপ-এককগুলির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কর্মচারীদের নিয়োগ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, স্তরের এমনকি জেলা কর্মচারীদের সরাসরি গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন ইঙ্গিত করে যে উত্তরবঙ্গ পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। দামোদরপুরের আরেকটি শিলালিপি, (৫৪৪ খ্রী:) একজন সার্বভৌম শাসককে নির্দেশ করে, যার নাম গুপ্ত-এ শেষ হয়েছিল, কিন্তু যার সঠিক নাম হারিয়ে গেছে। ঐ একই সময় গুপ্ত সম্রাটের পুত্র পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এটি সম্ভবত মনে হয় যে গুপ্ত বংশের পরবর্তী শাসকরা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর বাংলার উপর আধিপত্য দাবি করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমতট অঞ্চল সম্ভবত একটি আধা-স্বাধীন রাজ্য ছিল। গুনাইঘর তাম্রশাসন অনুসারে মহারাজা বৈন্যগুপ্ত এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন। এই অঞ্চলে দ্বাদশাদিত্যের জারি করা বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। অধিকাংশ গবেষক এই রাজাকে বৈন্যগুপ্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। যদিও বৈন্যগুপ্ত রাজকীয় গুপ্ত শাসকদের অধীনে একজন সার্বভৌম শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি তার নিজের সাক্ষ্যে মহারাজা এবং নালন্দায় আবিষ্কৃত একটি সীলমোহরে মহারাজধিরাজ উপাধি পেয়েছিলেন। তাই তার সঠিক অবস্থা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। আর. সি. মজুমদারের মতে বৈন্যগুপ্ত সম্ভবত গুপ্ত পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন এবং প্রথমে একজন প্রকৃত স্বাধীন শাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন যার আধিপত্য পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যিক গুপ্ত শাসকদের পতনের পর্যায়ে তিনি গুপ্ত শাসনের পতনের কারণে অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে নিজেকে সম্রাট হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যদিও বৈন্যগুপ্তের রাজনৈতিক কর্মজীবন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে সমতটের ওপর সরাসরি গুপ্ত শাসনের প্রমাণ দেয়। এইভাবে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত শাসকরা বাংলায় তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে সফল হন। বাংলায় তাদের ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি। এই প্রশাসনিক এককটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন বলে গুপ্ত সম্রাট নিজেই এর শাসক নিয়োগ করেছিলেন যার উপাধি ছিল উপারিকা বা বিষয়পাতি। সম্ভবত পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির উপরিকা রাজপরিবার থেকে এসেছিলেন।

৫(ক).৪ সাম্রাজ্যিক গুপ্ত শাসকদের অধীনে প্রশাসন

প্রকৃতপক্ষে একটি সামগ্রিক একক রূপে ছিল না বলে প্রাচীনকালে বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো জানা খুবই কঠিন কাজ। সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত শাসকদের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সাক্ষ্য আমাদের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি আধা-স্বচ্ছ ছবি আঁকতে সাহায্য করেছিল। যদিও বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু গুপ্ত শাসকগণ কখনোই সমগ্র অঞ্চলে সরাসরি শাসন করেননি। গুপ্তের সাক্ষ্যে বেশ কিছু মহাসামন্ত, সামন্ত, মহারাজা প্রভৃতি সামন্ত প্রধানের অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে। বাংলায় গুপ্ত সাম্রাজ্যিক অঞ্চল কয়েকটি প্রশাসনিক একক এবং উপ-এককে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে বড় একক ছিল ভুক্তি। ভুক্তি

আবার বিষয় এবং মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম বা গ্রাম। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে একটি প্রশাসনিক এককের নাম পাওয়া গেছে যাকে বলা হয় ভিতি। এই প্রশাসনিক এককের এর সঠিক প্রকৃতি এবং এর অবস্থান স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। কোনো কোনো গবেষকের মতে একগুচ্ছ গ্রাম নিয়ে ভিতি গঠিত হত এবং গুপ্ত প্রশাসনিক কাঠামোতে মণ্ডল ও গ্রামের মধ্যে এর অবস্থান ছিল। একজন ভুক্তির শাসক সরাসরি গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রাদেশিক শাসক উপারিকা উপাধি গ্রহণ করেন। বিষয় (Vishaya) কুমারমাত্য এবং আয়ুক্তক দ্বারা শাসিত হয়েছিল। কখনও কখনও বিষয়ের শাসকরাও বিষয়পতি নামে পরিচিত ছিলেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিম্ন প্রশাসনিক পদ ছিল অধিকরণ। সম্ভবত তারাই ভিথির দায়িত্বে ছিল।

৫(ক).৫ গুপ্ত আমলে বাংলার ব্রাহ্মণ্যকরণ

বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন শিলালিপিগুলি বাংলায় বেশ কিছু ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ রাখে না যারা বৈদিক আচার ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। এটা আকর্ষণীয় যে ব্রাহ্মণেরা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলায় বসতি স্থাপন করতে বেশ আগ্রহী ছিল। ধনাইদহ তাম্রশাসনের শিলালিপি (৪৩২-৪৩৩ খ্রি:) থেকে জানা যায় যে একজন রাজকীয় কর্মকর্তা (একজন আয়ুক্তক) সরকারকে স্বাভাবিক মূল্য পরিশোধ করে কিছু চাষযোগ্য জমি ক্রয় করেছিলেন এবং বরাহস্বমিন নামে একজন ব্রাহ্মণকে বিনামূল্যে উপহার দিয়েছিলেন, যিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের সামবেদি ধারার অনুসারী ছিলেন। গুপ্ত ১২১তম বছরে (= ৪০০-৪০১ খ্রিস্টাব্দ) কালাইকুড়ি তাম্রশাসনের শিলালিপিতে প্রতিটি কুল্যাবাপার জন্য ২ দিনার হারে ৯ কুল্যাবাপা জমি কেনার কথা বলা হয়েছে, যা হস্তশিরসা, বিভিটাকা, গুভ্যাগন্ধিকা এবং ধন্যাপটল গ্রামে বিতরণ করা হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধনের দেবভট্ট, অমরদত্ত এবং মহাসেনদত্ত নামে তিনজন ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন, যাতে তারা তাদের প্রতিদিনের বলিদান করতে সক্ষম হন।

লোকনাথের তিপ্পেরা তাম্র শাসন অনুসারে ভূমি দানের ফলে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চারটি বেদে (চতুর্বিদ্যা) পারদর্শী এক শতাধিক ব্রাহ্মণকে বসতি স্থাপনের জন্য একজন মহা সামন্তের অনুরোধে এই উপহার দেওয়া হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণদের কাছে সুভঙ্গবিষয় মন্দিরে অনন্ত নারায়ণের পূজোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। জয়নাগের ভাপ্যঘোষবত অনুদান ব্রহ্মবীরস্বমিন নামে একজন ব্রাহ্মণকে একটি গ্রাম উপহার দেওয়ার কথা লিপিবদ্ধ করে, যিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের সামবেদি ধারার অনুসারী ছিলেন।

৫(ক).৬ সারাংশ

সুতরাং উপসংহারে বলা যেতে পারে যে গুপ্ত আমলে তথাকথিত বাংলা অঞ্চলে একত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অন্তত এই সময় থেকে অভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এটি প্রমাণ করে না যে গুপ্ত শাসকরা সমগ্র অঞ্চল জয় করেছিলেন বা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এটি এই সমগ্র অঞ্চল এবং এর শাসকদের উপর গুপ্ত প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তত একটি বড় প্রভাব নির্দেশ করে। বাংলার পাল শাসকদের আমলেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৫(ক).৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. গুপ্ত শাসনের পূর্বে বাংলার অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. গুপ্ত শাসকদের অধীনে বাংলার অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৫(ক).৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

মজুমদার, আর. সি., (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

পাল, সায়ন্তনী, *'বাংলার গুপ্ত শাসন'*, *ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সম্মেলন,, ৬৯তম অধিবেশন, কান্নুর, ২০০৮*।

একক ৫(খ) ❑ বাংলায় স্বাধীন রাজ্য

গঠন

৫(খ).০ উদ্দেশ্য

৫(খ).১ ভূমিকা

৫(খ).২ বৈন্য গুপ্ত

৫(খ).৩ সারাংশ

৫(খ).৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৫(খ).৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৫(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- প্রাচীন বঙ্গের খণ্ডিত রাজনৈতিক সত্ত্বাকে অনুধাবন করা।
- বৈন্যগুপ্ত-র রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাস ব্যাখ্যা করা।

৫(খ).১ ভূমিকা

বাংলা প্রদেশ এবং বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল এক নয়। বাংলাভাষী জনগণের অধ্যুষিত অঞ্চলটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমানা বা এমনকি ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের বাইরেও বিস্তৃত। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিশাল ভূখণ্ড মুসলিম শাসনের আগে পর্যন্ত একত্রিত হয়নি। মুসলিম শাসনকালে তথাকথিত বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা একত্রিত হয়। তার আগে সমগ্র অঞ্চলটি অসংখ্য ছোট স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন রাজ্য এবং প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এমনকি পাল রাজবংশ ও সেন রাজবংশের শাসনকালেও বাংলায় বেশ কিছু ছোট রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এইভাবে এটা উল্লেখ করা সত্যিই বাহুল্য যে, প্রাচীন যুগে সমগ্র ভূখণ্ডটি অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল—তাদের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন কারণে অন্যান্য বৃহত্তর রাজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল; তাদের কিছুটা সামন্তের মর্যাদা ছিল; এই রাজ্যগুলির অধিকাংশই স্বাধীন ছিল যদিও তাদের আয়তন খুবই ছোট।

বাংলা মৌর্য ও তাদের পরবর্তী সম্রাটদের অধীন ছিল কি না তা আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। গুপ্ত শাসকরা নিশ্চিতভাবেই এই অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটা সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের এই সম্প্রসারণের জন্য দায়ী ছিলেন। তবে এটাও নিশ্চিত করে বলা কঠিন যে বাংলা কোন গুপ্ত শাসকের সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল—চন্দ্রগুপ্ত না-কি সমুদ্রগুপ্ত। মেহেরাউলি লৌহস্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা চন্দ্র বঙ্গের সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাস্ত করেছিলেন। এই রাজা চন্দ্রের পরিচয় বিতর্কের বিষয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তিনি গুপ্ত সম্রাট প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। এই অনুমান মেনে নিলে বলতে হবে সমুদ্রগুপ্তের আগেই গুপ্তরা বাংলা জয় করেছিল। দ্বিতীয় অনুমান অনুসারে, সমুদ্রগুপ্তের বাংলা জয়ের পর তাঁর পুত্রকে পুনরায় বাংলা জয় করতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত রাজা চন্দ্র গুপ্ত বংশের কেউ নয়।

যদিও এটা স্পষ্ট নয় যে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে বাংলার ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্য কে দায়ী ছিল তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বাংলায় বিভিন্ন রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্বের অবসান ঘটায়, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে। সমতট অঞ্চল ব্যতীত সমুদ্রগুপ্তের সময়কালে সমগ্র অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সমতটের শাসক 'সম্রাট' সমুদ্রগুপ্তকে সমস্ত ধরনের শ্রদ্ধা, তাঁর আদেশের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিল। অন্য কথায় সমতট ছিল একটি করদ রাজ্য যা গুপ্ত সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করে কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সাথে। সমতটের সঠিক সীমা নির্ণয় করা যায় না তবে এটিকে মোটামুটিভাবে পূর্ব বাংলার সমতুল্য হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। যদিও সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সমতট একটি আধা-স্বাধীন সামন্ত রাজ্য ছিল, তবে মনে হয় ধীরে ধীরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ৫০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে। মহারাজা বৈন্য গুপ্ত এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন এবং তিপ্পেরা জেলায় জমি প্রদান করেছিলেন। তিনি স্বর্ণমুদ্রা জারি করেন এবং দ্বাদশাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। বৈদ্য গুপ্তের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ। সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি এই যে তিনি সাম্রাজ্যিক গুপ্ত পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন এবং প্রথমে একজন আধা স্বাধীন শাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন যার আধিপত্য পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যিক গুপ্ত শাসকদের পতনের সুযোগ নিয়ে এবং সম্ভবত অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে তিনি নিজেকে সম্রাট হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

৫(খ).২ বৈন্য গুপ্ত

বৈন্য গুপ্ত ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ রাজাদের একজন। ৫০৭ খ্রি: বা ১৮৮ গুপ্ত যুগের গুনাইঘর তাম্রশাসনের শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে তাঁর কথা আমরা জানতে পারি। গুণাইকঅগ্রহারে (বর্তমান গুনাইগর) স্থাপিত একটি বৌদ্ধ বিহারকে জমি দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। বৈন্য গুপ্ত সম্ভবত পুরু গুপ্তের ছেলে। নালন্দার মৃৎ সিলমোহর ও গুনাইগর তাম্রশাসনের শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কারের পর ঐতিহাসিকরা বৈন্য গুপ্ত সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রত্নসামগ্রীতে তার পিতা বা পিতামহের নাম নেই। রমেশচন্দ্র

মজুমদারের মতে বৈন্যগুপ্তের পিতা ছিলেন পুরু গুপ্ত। গুনাইগর তাম্রফলকের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে বৈন্য গুপ্ত গুনাইঘরের একটি বৌদ্ধ বিহারে জমি দান করেছিলেন। মজুমদার এবং ডি. সি. গাঙ্গুলী অন্যদের মধ্যে মনে করেন যে গুনাইঘর তাম্রফলকের শিলালিপিতে উল্লিখিত বৈন্য গুপ্ত এবং নালন্দা মাটির শিলালিপির বৈন্য গুপ্ত যিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের একজন শাসক ছিলেন একই ব্যক্তি। যাইহোক, গুনাইগর তাম্রশাসনের শিলালিপির বৈন্য গুপ্ত শিবের ভক্ত এবং নালন্দা শিলালিপির বৈন্য গুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও পতনের বিভিন্ন পর্যায় এখনও নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে কোন সন্দেহ নেই যে এটি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে পতনের দৃশ্যমান লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময় উত্তর ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছিল। বৈন্য গুপ্ত এই সময়ে পূর্ব বাংলায় কার্যত একজন স্বাধীন রাজা হিসেবে শাসন করছিলেন। যশোধর্মনের ব্যাপক বিজয়ের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে চূড়ান্ত আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যশোধর্মনের মন্দাসোর শিলালিপি অনুসারে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের মতো তার বিজয়কে প্রসারিত করেছিলেন। তবে প্রকৃতপক্ষে এই দাবি কতদূর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। কিন্তু যশোধর্মনের সাম্রাজ্য স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি পরে এর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হুনদের আক্রমণে ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়া গুপ্ত সাম্রাজ্য যশোধর্মনের আক্রমণের আগে ভেঙে পড়ে।

৫(খ).৩ সারাংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন এবং যশোধর্মনের সাম্রাজ্যিক প্রয়াসের পুনর্নির্মাণের ব্যর্থতা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক খণ্ডীকরণকে স্পষ্ট করে যা অনেকগুলি স্বাধীন শক্তির উত্থানের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। এদের মধ্যে আরও বিশিষ্ট ছিলেন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি, কোশল বা অযোধ্যার মৌখরী এবং মগধ ও মালবের পরবর্তী-গুপ্তরা। পরবর্তী-গুপ্তরা হয়তো সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তদের একটি শাখা ছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এই মতের সমর্থনে কোনো ইতিবাচক প্রমাণ নেই। তবে তারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্য ও পূর্ব অংশে গুপ্ত সার্বভৌমত্বের ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছে। বাংলাও বিদেশি জোয়াল ঝেড়ে ফেলতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে এবং দুটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য যেমন (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে) বঙ্গ ও গৌড় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫(খ).৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বাংলায় গুপ্ত-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২. বৈন্যগুপ্তের উপর একটি ছোট টীকা লিখুন।

৩. গুপ্ত শাসনের পতনের সময় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৫(খ).৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

একক ৫(গ) ❑ সমতট অথবা বঙ্গ রাজ্য

গঠন

৫(গ).০ উদ্দেশ্য

৫(গ).১ ভূমিকা

৫(গ).২ গোপচন্দ্রের পর সমতট ও বঙ্গ

৫(গ).৩ খড়্গ শাসকদের অধীনে বাংলা

৫(গ).৪ সারাংশ

৫(গ).৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৫(গ).৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৫(গ)০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- সমতট বা বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসকে বোঝা।
- গোপচন্দ্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করা।
- খড়্গ শাসনাধীন বাংলার ইতিহাস অনুধাবন করা।

৫(গ).১ ভূমিকা

সমতট অঞ্চলের জনবসতি সুদীর্ঘকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল। রাজা চন্দ্রের মেহরাউলি শিলালিপিতে, বাতাপির চালুক্যদের লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যে এবং বিখ্যাত কবি কালিদাসের সাহিত্যকর্মে এর উল্লেখ রয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের আগে বাংলা কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকে এই বিভিন্ন রাজ্যগুলি তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়েছিল এবং সমুদ্রগুপ্ত দ্বারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে শুধু একটি ব্যতিক্রম ছিল—সমতট বা বঙ্গ রাজ্য। এলাহাবাদ স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে সব ধরনের সম্মানী প্রদানের মাধ্যমে, তাঁর আদেশের আনুগত্য করে এবং তাঁর কাছে দরবার করার পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তুষ্ট করেছিলেন'। অন্য কথায়, সমতট ছিল একটি করদ রাজ্য। যদিও এটি গুপ্ত সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করেছিল কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে

এটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করেছিল। সমতটের সঠিক ভৌগোলিক সীমা নির্ণয় করা যায় না তবে এটিকে বর্তমান বাংলার পূর্বাঞ্চলের মোটামুটি সমতুল্য হিসেবে ধরা যেতে পারে।

যদিও সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সমতট একটি আধা-স্বাধীন সামন্ত রাজ্য ছিল কিন্তু এটি সাধারণত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে সমতট অঞ্চলের শাসক হিসেবে একজন মহারাজা বৈন্যগুপ্তের নাম উল্লেখ আছে। বৈন্যগুপ্তের সঠিক প্রতিষ্ঠা বা পদমর্যাদা নির্ণয় করা কঠিন। সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে তিনি সাম্রাজ্যিক গুপ্ত পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন এবং প্রথমে একজন প্রকৃত স্বাধীন শাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন যার আধিপত্য পূর্ব বাংলার উপর ছিল। পরবর্তীকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে এবং সম্ভবত অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে বৈন্যগুপ্ত নিজেকে সম্রাট হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

এইভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে বাংলায় প্রথম যে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয় তা নিঃসন্দেহে সমতট বা বঙ্গ রাজ্য। এটি মূলত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত বলে মনে হয়। এই রাজ্যের কালানুক্রমিক রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠন করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ কারণ সেই সময়ের অল্পই কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই রাজ্যের তথ্যের প্রধান উৎস হল বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ার কাছে আবিষ্কৃত পাঁচটি শিলালিপি এবং বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি। এই লিপির সাক্ষ্য অনুসারে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব নামে তিনজন শাসক এই রাজ্য শাসন করেছিলেন। সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। এটা প্রমাণ করে যে এই রাজারা স্বাধীন ও শক্তিশালী ছিলেন। এই রাজকীয় উপাধিটি একটি পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থা এবং এই অঞ্চলের উপর সাম্রাজ্যিক গুপ্ত রাজবংশের সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্বের অবসানও নির্দেশ করে।

গোপচন্দ্রের রাজত্বের সঠিক তারিখ আমাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে বৈন্যগুপ্ত ও গোপচন্দ্রের রাজত্বের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান ছিল না। এই অনুমানের পিছনের কারণ হল একজন মহারাজা বিজয় সেনের অস্তিত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ যিনি সম্ভবত বৈন্যগুপ্ত এবং গোপচন্দ্র উভয়েরই একজন সামন্ত প্রধান ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী বিজয় সেন গোপচন্দ্রের অধীনে বর্ধমান ভুক্তির শাসক ছিলেন। যেহেতু তিনি বৈন্যগুপ্তের অধীনেও একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই বৈন্যগুপ্তও বাংলার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন বলে ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না।

গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেবের মধ্যে সম্পর্ক আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় এবং তাদের উত্তরাধিকারের ক্রমও পরিষ্কার নয়। পারজিটার ধর্মাদিত্যকে দুটি কারণে গোপচন্দ্রের চেয়ে আগের বলে গণ্য করেছেন : প্রথমত, তাদের নিজ নিজ তাম্রশাসনে 'ya'-এর পূর্বের এবং পরবর্তীরূপের ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত ভূমি-মাপক শিবচন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত উপাধি 'প্রতিভা ধর্ম শীল' প্রয়োগ করা। প্রথমটি কখনই একটি গুরুতর যুক্তি হিসাবে সামনে রাখা উচিত ছিল না। কারণ এটা স্পষ্ট যে প্রাচীন লিপিবিজ্ঞান অনুসারে এই ধরনের স্বল্প সময়ের সাক্ষ্য যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষ করে এর সময়কাল যদি একশ বছরের কম হয়। বর্তমান দৃষ্টান্তে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে গোপচন্দ্রের মল্লাসারুল শিলালিপিতে পারজিটার দ্বারা উল্লেখিত 'ya' অক্ষরের তিনটি রূপের মধ্যে প্রথম দিকেরটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে

ধর্মাদিত্যের প্রথম তাম্রশাসনটি 'শ'-এর একটি সুস্পষ্টভাবে পরবর্তী রূপ দেখায়। শিবচন্দ্রের উপাধি সংযোজন-এর ভিত্তিতে বলা যায় না যে তিনিই পূর্ববর্তী। এটি রচয়িতার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত কারণে হতে পারে। সাধারণভাবে এই কথা মনে করা যেতে পারে গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্যের চেয়ে আগে এই মতই গ্রহণ করা বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সাধারণত গোপচন্দ্র ও ধর্মাদিত্যের রাজত্বের পরে সমাচারদেব রাজত্ব করেছিলেন বলে করা হয়; তবে নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে সেখানে কোনো মধ্যবর্তী রাজা ছিলেন না।

সমাচারদেবের পরে এই ধারার কয়েকজন রাজার অস্তিত্বের সম্ভাবনা অনেক বেশি সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা পাওয়া যায় যা বেশিরভাগই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে সাভার (বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়) এবং কোটালীপাড়া (জেলায়)। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে মাত্র দুটিতে রাজাদের নাম রয়েছে যা কিছুটা নিশ্চিতভাবে পড়া যায়। প্রথমটিতে 'পৃথু ভি (রা)' অক্ষর রয়েছে। যে রাজা এটি জারি করেছিলেন তার নাম সম্ভবত, তাই, পৃথুভিরা বা পৃথুজভিরা বা পৃথুবিরাজা। দ্বিতীয় মুদ্রাটি একটি শ্রেণির অন্তর্গত যার বেশ কয়েকটি পাওয়া গেছে। তাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রে কিংবদন্তিটি সুধন্যা হিসাবে পড়া হয়েছে, তবে সুধন্যা 'শ্রীসুধন্যাদিত্য'-র হতে পারে। স্বর্ণমুদ্রায় এই সকল রাজাদের নাম পাওয়া যায় না; কিন্তু সম্ভবত এঁরা বঙ্গের শাসক ছিলেন এবং গোপচন্দ্রের পরবর্তীকালে ছিলেন। সম্ভবত বঙ্গে শাসন করতেন সমকালীন তাম্রশাসন থেকে এই রাজাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। প্রশাসনের কাঠামো গুপ্ত প্রশাসন থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। ভুক্তি এবং বিষয় ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক। এই সমস্ত সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে যে বাংলায় একটি স্বাধীন, শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সরকার ছিল যা জনগণের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি এনেছিল এবং শাসকগণ তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিল।

৫(গ).২ গোপচন্দ্রের পর সমতট ও বঙ্গ

যদিও সমতট রাজ্যের ছয়টি তাম্রশাসনের অনুদান প্রশাসনের বিস্তারিত তথ্য দেয় তবে শাসকদের বংশতালিকা বা বিস্তারিত রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে এগুলি নীরব। সুতরাং গোপচন্দ্র কর্তৃক এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্য কতদিন টিকে ছিল এবং কীভাবে তা শেষ হয়েছিল তা এখনও আমাদের অজানা। হিউয়েন সাং তার বিবরণে সমতট রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন যা পুরো বঙ্গ না হলেও প্রধান অংশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে মনে হয়। হিউয়েন সাঙের মতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমতট এবং বঙ্গ অঞ্চলগুলি ব্রাহ্মণ শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। কিছু গবেষক অনুমান করেন যে শাসকদের এই শ্রেণিটি ভদ্র রাজবংশের অন্তর্গত ছিল। হিউয়েন সাং শিলা ভদ্রের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাস্কর বর্মণের নিধানপুর তাম্রশাসনের শিলালিপিতে জ্যেষ্ঠভদ্র নামে একজন সামন্ত প্রধানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি উল্লেখ ইঙ্গিত দেয় যে সম্ভবত শাসক বংশের একজন সদস্য ছিলেন যার নামের শেষে ভদ্রযুক্ত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত এই মতের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। পারিবারিক নাম যাই হোক না

কেন ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ বৌদ্ধ রাজাদের একটি শাখার দ্বারা উৎখাত হয়েছিল বলে মনে হয় যারা তাদের নামের সাথে খড়্গ শব্দটি তাদের পারিবারিক নাম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এই কারণে রাজবংশটি সাধারণত খড়্গ রাজবংশ নামে পরিচিত।

৫(গ).৩ খড়্গ শাসকদের অধীনে বাংলা

খড়্গ রাজবংশ খ্রিস্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলার বঙ্গ ও সমতট অঞ্চল শাসন করেছিল। রাজবংশ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার কাছে আশরাফপুরে আবিষ্কৃত দুটি তাম্রশাসন অনুদান, মুদ্রা এবং শেং-চে-এর চিনা বিবরণ থেকে। খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দী ইত্যাদির মধ্যে আশরাফপুর তাম্রশাসনের অনুদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজবংশের প্রথম পরিচিত শাসক হলেন খড়্গোদ্যম যিনি সম্ভবত ৬২৫ এবং ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শাসন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার পূর্বসূরিদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। খড়্গোদ্যমের উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র জাতখড়্গ যিনি শাসন করেছিলেন ৬৪০ এবং ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। উত্তরাধিকারের ধারা অব্যাহত ছিল তাঁর পুত্র দেবখড়্গের মাধ্যমে যিনি রাজত্ব করেছিলেন ৬৫৮ এবং ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং তাঁর নাতি রাজাভট ৬৭৩ এবং ৬৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শাসন করেছিলেন। রাজাভটের সম্ভবত তাঁর ভাই বালভটের পর যিনি শাসন করেছিলেন ৬৯০ এবং ৭০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। দ্বিতীয় আশরাফপুর তাম্রশাসন অনুদান একটি উদিরনাখড়্গাকে নির্দেশ করে। তার নামের শেষ অংশটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে তিনিও সম্ভবত খড়্গ রাজবংশের অন্তর্গত ছিলেন, তবে তার রাজত্বকাল এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।

খড়্গ রাজারা পরমেশ্বর ও মহারাজাধিরাজ ইত্যাদির মথো কোনো উপাধি ব্যবহার করেননি। এটি নির্দেশ করে যে তারা স্থানীয় শাসক ছিলেন। তাদের ভূখণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। আশরাফপুর তাম্রফলকের অনুদানের একটিতে নরসিংদীর রায়পুর উপ-জেলার অন্তর্গত তালপাড়া ও দাতগাঁও গ্রামের যথাক্রমে তালপাতাকা ও দত্তকটকের উল্লেখ রয়েছে। খড়্গরা বঙ্গ অঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিল। আশরাফপুর তাম্রশাসন অনুদান জয়কর্মান্তভাসকের জয়স্কন্ধভর থেকে জারি করা হয়েছিল, যা বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বরকান্ত বা বাদকমতার সাথে চিহ্নিত করা হয়েছিল, ১৩তম রাজত্ব বর্ষে যা ছিল ৬৭১ খ্রিস্টাব্দের দেবখড়্গ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে দেবখড়্গ (যিনি ৬৬০ এবং ৬৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শাসন করেছিলেন) বঙ্গ থেকে সমতট পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা প্রসারিত করেছিলেন। এটি রাণী প্রভাবতীর দেউলবাড়ি শিলালিপি (এই শিলালিপিতে সর্বাণী বা দুর্গার চিত্র অঙ্কিত আছে) চিত্র শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত। শিলালিপিতে দেবখড়্গাকে দানশীল (দানপতি) এবং শক্তিশালী (প্রতাপী) এবং সমস্ত শত্রুদের বিজয়ী পরাজিত করে) হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। বিজয়ের জন্য সম্ভবত ধর্মীয় স্থাপন নির্মাণ বা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বৈধতার প্রয়োজন ছিল। যুগের ঐতিহ্য অনুসারে, এটি দেবখড়্গ বৌদ্ধ মঠ স্থাপনে জমি দান করেছিলেন।

আশরাফপুর তাম্রশাসন অনুদান উভয়ই সম্পষ্ট করে যে দেবখড্গ এবং তার পুত্র রাজাভট একসঙ্গে ১৫টি পটক এবং ২০টি দ্রোণ জমি দান করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু সংঘমিত্রার দায়িত্বে থাকা চারটি বিহার ও বিহারিকাকে। প্রতিটি বিহারে দান করা জমির পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪৮৪ বিঘা (১ পটক কমপক্ষে ১২৮ বিঘা)। দেবখড্গ অবশ্য মঠগুলো নির্মাণ করা হয়নি; বরং এইগুলি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল এবং খড্গ রাজা সেগুলিকে একক প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন (একগণ্ডীকৃত) যার ফলে এটি একটি পবিত্র ভূমিতে পরিণত হয়।

দানকৃত জমিগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক লাভের চেষ্টা করা হয়। অনুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি কৃষ্যমানককে বোঝায়, যার অর্থ কৃষক। কৃষকদেরকে নিছক কৃষি শ্রমিক বলে মনে হয় কারণ তারা জমির মালিক ছিল না বা তাদের জমি ভোগ করার কোনো অধিকার ছিল না; জমির মালিকানা ছিল মঠের। এবং জমিগুলি অনুদানে উল্লিখিত ভুজ্যমানকদের আরেকটি স্তর দ্বারা ভোগ করা হয়েছিল। যারা জমি (ভুজ্যমানক) উপভোগ করত তারা প্রকৃতপক্ষে যারা চাষ করত তাদের থেকে আলাদা ছিল। এই পার্থক্যটি প্রচলিত তিন স্তরের ভূমি ব্যবস্থার ধারণার দিকে নিয়ে যায় : জমির মালিকানাধীন মঠ (বিহার এবং বিহারিকা), সুবিধাভোগী (ভুজ্যমানক), এবং প্রকৃত কৃষক (কৃষ্যমানক)। এই ব্যবস্থাটি যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে (রচনাকাল ২০০ খ্রিস্টপূর্ব-২০০ খ্রিস্টাব্দ) মহিপতি (রাজা), ক্ষেত্রস্বামী (ভূমিমালিক) এবং কর্ষক (প্রকৃত চাষী) এর মতোই ছিল বলে মনে হয়।

দেবখড্গ এবং তার পুত্র রাজাভট উভয়েই সমতটের বৌদ্ধ প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন। চিনা সন্ন্যাসী শেং-চে চ্যান শিহ লিখেছেন যে তিনি যখন সমতটে আসেন (তাঁর আগমনের সময় জানা যায় না) তখন দেশের রাজা ছিলেন হো-লু-শে-পো-তো বা রাজরাজকট—দেবখড্গার পুত্র। তিনি তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতেন বা শ্রদ্ধা করতেন—বুদ্ধ, আইন-শৃঙ্খলা এবং বুদ্ধকে অনুসরণকারী উপাসক। রাজা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রতিদিন সকালে রাজার পক্ষ থেকে একজন আধিকারিককে মঠে পাঠানো হত শেং-চে সহ বাসিন্দা ভিক্ষুদের কল্যাণ জিজ্ঞাসা করার জন্য। যে বিহারে সন্ন্যাসীরা এবং মহান চে বাস করতেন। সেটিই ছিল রাজবিহার। এই রাজবিহারটি বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসনে (খ্রী: ৫০৭) উল্লিখিত ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। এই সমস্ত সমর্থন/পৃষ্ঠপোষকতাগুলিকে তার রাজকীয় ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য রাজার প্রচেষ্টা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

দেবখড্গের আরেক পুত্র বলভাতের তাম্রশাসন বর্ণনা করে যে তিনি বিহার ও স্তূপের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আশ্রমের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ধনলক্ষ্মীপাটক (এই এলাকাটি কোথায় জানা যায়নি) এলাকায় ২৮ পটক জমি দান করেছিলেন। এই অনুশাসনটি মহাভোগক্ষাশ্রমকে নির্দেশ করে, যার অর্থ সম্ভবত সেই আশ্রম যেখানে বিশাল ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হত। বিহারগুলি দৃশ্যত সংখ্যায় আটটি ছিল; পারমিতামতম এবং দানচন্দ্রিকা শেখানো এবং আলোচনা করা হয়েছিল। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের (বৌদ্ধ ত্রিরত্ন) নামে নির্মিত আবাসিক ধর্মীয় কাঠামোর জন্য দানগুলি দৃশ্যত করা হয়েছিল।

প্রথম আশরাফপুর তাম্রশাসন অনুদান, রাজবংশের ধর্মীয় ঝোঁক সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আমাদের দেয়। এটি ধর্মচক্র নয় বরং বাম দিকে মুখ করা ষাঁড়ের নীচে শ্রীমৎ দেবখড্গ নামের শিলালিপিকে নির্দেশ করে। এটি দেবখড্গের শৈব ঝোঁকের ইঙ্গিত দিতে পারে যা তার পুত্র বলভটের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল বলে মনে হয় যিনি তার তাম্রশাসনে নিজেকে পরমহেশ্বর রাজপুত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দেবখড্গার রাণী প্রভাবতীও বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দেউলবারি গ্রামে দেবীর (*mahadevibhaktyahemaliptamakaryat*) প্রতি শ্রদ্ধার জন্য দেবী সর্বাণীকে সোনার পাতা দিয়ে আবৃত করেছিলেন। দেবী সর্বাণীর আটটি বাহু রয়েছে যা বিদ্যুৎ, ঘণ্টা, ধনুক, ঢাল বামদিকে ধারণ করে। এবং শঙ্খ, তলোয়ার এবং ডানদিকে চক্র। তিনি একটি সিংহের পিঠে অঙ্কুশ পদ্ম-আসনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেউলবারি চিত্রের শিলালিপিতে কোথাও উল্লেখ নেই যে দেবী সর্বাণী দেউলবারিতে নির্মিত ও স্থাপন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা শিলালিপিটি দেখি তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে দেউলবারিতে দেবীর মূর্তিটি আগে থেকেই ছিল যখন রাণীকে সোনার পাতা দিয়ে আবৃত করা হয়। দেবখড়্গ, তার রাণী প্রভাবতী এবং তাদের পুত্র বলভটের শৈব ঝোঁককে সমতটে (সদ্য বিজিত এলাকায়) খড়্গ রাজশক্তি স্থিতিশীল করার একটি কাজ হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

৫(গ).৪ সারাংশ

এই এককে সমতট ও বঙ্গ অঞ্চলের আদি ইতিহাস আলোচনা করা হল। এই অঞ্চলের আদি ইতিহাসের সঙ্গে মৌর্য ও গুপ্ত যুগের সময়কালকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যিক মৌর্য বা গুপ্তদের কেন্দ্রিভূত প্রশাসনিক কাঠামোর অচ্ছেদ্য অংশ রূপে এই অঞ্চলের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়। বরং গুপ্তদের অবক্ষয়ের পর বাংলার এই অঞ্চলে স্থানীয় স্বাধীন শক্তির বিকাশ ঘটে। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব ছিলেন স্থানীয় ভাবে বিকশিত রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক। বাংলার এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম এই সময়ে প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি শৈব ধর্মের প্রভাবও যে ছিল তা আমাদের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুমতের অস্তিত্ব প্রাচীন বাংলায় ছিল; সমতট ও বঙ্গ এর ব্যতিক্রম ছিল না।

৫(গ).৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. গুপ্ত-পরবর্তী সময়ে সমতটের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. খড্গ শাসকদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন।

৫(গ).৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

একক ৬ ❑ গৌড়ের উত্থান

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ ভূমিকা

৬.২ গৌড় অঞ্চল

৬.৩ পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশ

৬.৪ সারাংশ

৬.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৬.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে গৌড়ের উত্থান পাঠ করা।
- গৌড়কে কেন্দ্র করে কীভাবে বাংলার ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে তা অনুধাবন করা।
- বাংলার ইতিহাসে পরবর্তী-গুপ্ত বংশের ভূমিকা আলোচনা করা

৬.১ ভূমিকা

গৌড় রাজ্য খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ভারতে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। গৌড় রাজ্যের মূল অঞ্চলগুলি বর্তমানে ভারতের বাংলা রাজ্য এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল, যার রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ শহরের কাছে কর্ণসুবর্ণে। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক গৌড়ের সংক্ষিপ্ত সময় কালে ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সাথে লড়াই করে গৌড়কে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গৌড় রাজ্য তার ক্ষমতা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরপরই রাজ্যটি তার

ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং তাই দ্রুত পতন ঘটে। কিন্তু পাল এবং সেন শাসকদের অধীনে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা সাম্রাজ্যিক রূপ ধারণ করে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন এবং যশোধর্মনের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ফলে পরবর্তীকালে অনেক স্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের ফলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। এই শক্তিগুলির মধ্যে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশ, কোশলের মৌখরী রাজবংশ এবং মগধের পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশ ছিল সবচেয়ে বিশিষ্ট। বাংলাও—এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল এবং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এখানে দুটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য, বঙ্গ ও গৌড় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৬.২ গৌড় অঞ্চল

গৌড় রাজ্যের উদ্ভব বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিতে চিহ্নিত। কিন্তু এই অঞ্চলের অনেক আদি ইতিহাস রয়েছে। পাণিনি তার ব্যাকরণ ভিত্তিক পাঠ্য অষ্টাধ্যায়ীতে গৌড়পুরের কথা উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রে গৌড়দেশ থেকে মগধে আসা সমৃদ্ধ পণ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই স্থানটি কামসূত্রের রচয়িতা বাৎস্যায়ন, বিখ্যাত কবি কালিদাস এবং আরও অনেকের কাছেও পরিচিত ছিল। বরাহমিহিরের মতে গৌড় বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা ছিল। ভবিষ্যপুরাণের পাঠে গৌড়কে বর্ধমানের উত্তরে এবং পদ্মা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত একটি অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বরাহমিহির তার বৃহৎসংহিতায় গৌড়কে বিশেষ করে পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের ভুক্তি, তাম্রলিপ্তিকা বা তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, সমতট এবং বর্ধমানের ভুক্তি থেকে আলাদা করেছেন।

অতঃপর তথাকথিত হিন্দু যুগ জুড়ে গৌড় ও বঙ্গ বাংলার দুটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিভাগকে ব্যাপকভাবে নির্দেশ করে। প্রথমটি সমগ্র উত্তর অংশ এবং সমগ্র বা অন্ততপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অংশ, এবং পরেরটি সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এই বিস্তৃত বিভাজনের প্রকৃত রাজনৈতিক সীমানা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও মোটের ওপর এই ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন প্রাচীনকাল জুড়েই ছিল। অন্যান্য বিভাগের নাম যেমন পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গ), রাঢ় বা সুহ্ম (পশ্চিমবঙ্গ), সমতট বা হরিকেল (পূর্ববঙ্গ) ইত্যাদি বিস্তৃত দুটি বিভাগের সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল। গৌড় এবং বঙ্গের ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনগুলি প্রাচীন যুগের আর্যাবর্ত (বিন্ধ্য পর্বতমালা উত্তর থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর ভারতকে নির্দেশ করে) এবং দক্ষিণপথ (বিন্ধ্য পর্বতমালা থেকে শুরু করে সমগ্র দক্ষিণ অংশকে বোঝায়) বিভাগের সাথে একই রকম।

৬.৩ পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশ

সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত রাজবংশের পতনের পর পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশ ক্ষমতায় আসে এবং মালব অঞ্চলের

মৌখারি রাজবংশের সমসাময়িক ছিল। পরবর্তী-গুপ্তরা মগধ অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। তারা গৌড়ভূমি জুড়ে তাদের সার্বভৌমত্ব বিস্তার করতে সফল হয়েছিল এবং শশাঙ্কের উত্থান পর্যন্ত তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। একই পারিবারিক নাম থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী গুপ্ত শাসকরা সাম্রাজ্যিক গুপ্ত শাসকদের সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত ছিল না। সম্ভবত তারা প্রথমে রাজকীয় গুপ্ত শাসকদের সামন্ত ছিল। ধীরে ধীরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে পরবর্তী-গুপ্তরা প্রাধান্য লাভ করে এবং প্রায় একই সময়ে মৌখরী শাসকদের মতো স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্তী-গুপ্ত শাসকরা অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের শাসন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন।

আদিত্যসেনের (৬৫৫ খ্রি:-৬৮০ খ্রি:) অপসাদ শিলালিপি থেকে এই রাজবংশের আদি ইতিহাস জানা যায়। এই শিলালিপি অনুসারে আদিত্যসেন ছিলেন এই রাজবংশের অষ্টম রাজা। এই শিলালিপিতে প্রদত্ত বংশবৃত্তান্তে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক হিসেবে কৃষ্ণগুপ্তের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হর্ষগুপ্ত। অন্যান্য শাসকদের মধ্যে জীবিতগুপ্ত, মহাসেনগুপ্ত এবং মাধবগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। অপসাদ শিলালিপিতে উল্লিখিত বংশতালিকা অনুসারে আদিত্যসেন ছিলেন মাধবগুপ্তের পুত্র। আদিত্যসেন প্রথম পরবর্তী-গুপ্ত শাসক যিনি সম্পূর্ণ রাজকীয় উপাধি ধারণ করেছিলেন। যদিও প্রথম দিকে পরবর্তী-গুপ্ত ও মৌখারিরা বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত ছিল কিন্তু পরে তাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয়। এমনকি তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও করেছে। রাজা কৃষ্ণগুপ্ত-র (যিনি প্রথম রাজা ছিলেন এই বংশের) রাজত্বকাল ছিল ৪৯০ খ্রি: থেকে ৫০৫ খ্রি:। তারপর তাঁর পুত্র হর্ষগুপ্ত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। রাজবংশের তৃতীয় শাসক জীবিতগুপ্ত ৫২৫ খ্রি: থেকে ৫৪৫ খ্রি:-এর মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা কুমারগুপ্তর রাজত্বকাল ছিল ৫৪০ খ্রি: থেকে ৫৬০ খ্রি:। তিনি প্রায় ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৌখারি রাজা ইশানবর্মণকে পরাজিত করেন। এভাবে তিনি সাম্রাজ্যিক কীর্তি স্থাপন করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে তিনি নিজেকে এই রাজবংশের প্রথম স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেহেতু ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের পরে রাজকীয় গুপ্ত পরিবারের কোনও তথ্য জানা যায় না, আমরা অনুমান করতে পারি যে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঈশানবর্মণ এবং কুমারগুপ্ত উভয়ই স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন।

কিছু গবেষক বিশ্বাস করেন যে পরবর্তী-গুপ্ত শাসকরা মূলত মালব শাসন করতেন এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বের পরেই তারা মগধ দখল করে। কুমারগুপ্ত ইশানবর্মণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পর প্রয়াগে মারা গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কুমারগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দামোদরগুপ্তের রাজত্বকালে এই দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল। দামোদরগুপ্ত মৌখরীদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন।

দামোদরগুপ্ত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে মহাসেনগুপ্তের বিপুল স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খুব সম্ভবত কামরূপ-শাসক সুস্থিতবর্মণকে পরাস্ত করেছিলেন। তবে মৌখারি এবং কামরূপ রাজার একযোগে আক্রমণ মহাসেনগুপ্তের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল।

পরবর্তীতে তাঁর রাজত্বকালেই শশাঙ্ক গৌড় (বাংলায়) একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চালুক্য রাজা কীর্তিবর্মণ যিনি শাসন করেছিলেন ৫৬৭ খ্রি: থেকে ৫৯৭ খ্রি: এই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ এবং মগধ আক্রমণ করেছিল বলে মনে করা হয়। Songtsen Gampo বা স্রোং-বহসন-স্পাম-লো তিব্বতের তৎকালীন রাজা, ৫৮১ খ্রি: থেকে ৬০০ খ্রি: পর্যন্ত যিনি শাসকরূপে ছিলেন, মহাসেনগুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীগুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্ত চালুক্য রাজা এবং তিব্বতের রাজা উভয়ের কাছেই পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর মহাসেনগুপ্ত মালবে আশ্রয় নিয়েছেন বলে মনে হয়। এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে পরবর্তীগুপ্ত শাসকরা উত্তর ভারতে হর্ষের সাম্রাজ্যিক রাজ্যের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। মহাসেনগুপ্তের মাধবগুপ্ত নামে একটি পুত্র ছিল। মাধবগুপ্তকে হর্ষবর্ধন আবার মগধের রাজা বানিয়েছিলেন এবং ৬৫০ খ্রি: তাঁর পুত্র আদিত্যসেন তার উত্তরাধিকারী হন।

দামোদরপুর তাম্রফলকের শিলালিপি অন্তত ৫৪৪ খ্রি: পর্যন্ত বাংলার উত্তরাঞ্চলে গুপ্তের সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করে। এটা খুব সম্ভবত যে এই গুপ্তরা পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশের সদস্য ছিলেন। পরবর্তী-গুপ্ত শাসক সাম্রাজ্যিক গুপ্ত শাসকদের সাথে রক্তের সম্পর্ক থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, তবে তারা সূচনায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। সাম্রাজ্যিক গুপ্ত শাসকদের উত্তরসূরি হিসেবে তাদের দাবি যে স্বীকৃত ছিল তা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ডের পরিভ্রাজক শাসকদের সাক্ষ্যে গুপ্ত আধিপত্যের উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের আধিপত্য সেই শতাব্দী জুড়ে উত্তরবঙ্গে অব্যাহত ছিল। তবে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়ের গুপ্ত আধিপত্য শান্তিপূর্ণ বা নিরবচ্ছিন্ন ছিল বলে মনে হয় না। যশোধর্মন যদি সত্যিই ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তাঁর সামরিক অভিযান করে থাকেন, (যা তিনি দাবি করেছিলেন), অবশ্যই তা গৌড়ের গুপ্ত শাসকদের ক্ষমতা এবং অবস্থানকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছিল। গৌড়ের গুপ্ত আধিপত্য এই বিপর্যয় থেকে বেঁচে গেলেও ধীরে ধীরে তা যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি গৌড় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রায় ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দের মৌখারি রাজা ঈশানবর্মণের হরহা শিলালিপিও গৌড় অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই শিলালিপির v. 13-তে রাজা দাবি করেছেন যে তিনি অন্ধ্রের প্রভুকে পরাজিত করেছেন এবং তিনি গৌড়গণকে পরাজিত করে তাদেরকে সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত গৌড়ের জনগণ সমুদ্র আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। সমুদ্রের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশানবর্মণের অন্ধ্র দেশে অভিযানের সাথে মিলিত সমুদ্রের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে গৌড়ের শাসকদের সাথে দ্বন্দ্ব পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে হয়েছিল। যদিও এই অঞ্চলটি ভৌগোলিকভাবে গৌড় দেশে ছিল কিন্তু এটি সম্ভবত ঈশান বর্মণের বিজয়ের সময় গোপচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ রাজ্যের একটি অংশ ছিল।

তাই বলা যেতে পারে যে ঈশানবর্মণ এবং গৌড়ের শাসকের মধ্যে লড়াই ছিল প্রাচীন যুগের শেষের

দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। স্পষ্টতই গৌড়কে আক্রমণ এবং গৌড়ের পরাজয় ছিল মৌখরী রাজবংশ এবং পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার ফলাফল কারণ গৌড় পরবর্তী-গুপ্ত শাসনের অধীনে ছিল। ঈশানবর্মণের স্থলাভিষিক্ত হন সর্ববর্মণ। তিনি সম্ভবত মগধের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। তিনি শাহাবাদ জেলার একটি গ্রাম মঞ্জুর করেন। এই ঘটনাটি নির্দেশ করে যে মগধের অন্তত কিছু অংশ তার দখলে ছিল। একইভাবে তার উত্তরসূরি অবন্তীবর্মণও মগধের কিছু অংশের অধিকারী ছিলেন। কোনো কোনো গবেষকের মতে, পরবর্তীকালে গুপ্ত রাজা কুমারগুপ্ত ইশানবর্মণকে পরাজিত করেন এবং তাঁর পুত্র দামোদরগুপ্তও মৌখরী শাসককে পরাজিত করেন। তাই এটা স্পষ্ট যে পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশ এবং মৌখরী রাজবংশের মধ্যে বংশগত লড়াইয়ে জয় পর্যায়ক্রমে উভয় পক্ষের দিকে ঝুঁকেছিল যার মধ্যে কেউই কোনো চূড়ান্ত সাফল্য দাবি করতে পারেনি।

গবেষকদের একটা অংশের মতে সর্ববর্মণ এবং অবন্তীবর্মণের সাফল্যের পর পরবর্তী গুপ্ত শাসকরা মগধ এবং গৌড় উভয়ই ত্যাগ করেন। সম্ভবত তারা মালবে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস যাই হোক না কেন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পরবর্তীকালে গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের শাসন গৌড়, মগধে এবং ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে মৌখরী ও গুপ্তদের মধ্যে সংঘর্ষে গুপ্তদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। উত্তরদিক থেকে তিব্বতীরা ও দক্ষিণ দিক থেকে চালুক্য শক্তির আক্রমণে পরবর্তী-গুপ্ত শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত, এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুবিধা নিয়েছিলেন শশাঙ্ক।

পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশ এবং মৌখরী রাজবংশের মধ্যে দীর্ঘ বৈরিতার মধ্যে ভাগ্য পরবর্তী-গুপ্ত শাসক মহাসেনগুপ্তের পক্ষে বেশি অনুকূল ছিল। তিনি কামরূপের শাসক সুস্থিতবর্মণ পরাজিত করেন। যদিও মহাসেনগুপ্তের আবাসভূমি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে এটি মালব নাকি মগধ ছিল, কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে মগধ এবং গৌড় উভয়ই তাঁর রাজত্বের অংশ ছিল এবং তিনি এই অঞ্চলগুলিতে মৌখারি আগ্রাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন। এই সময়ে গৌড়ের সঠিক রাজনৈতিক অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবত পরবর্তী-গুপ্ত রাজারা সরাসরি সমগ্র অঞ্চলটি পরিচালনা করতেন না। স্থানীয় সামন্তদের এটি দ্বারা শাসিত হত। এই স্থানীয় সামন্ত শক্তিবর্গ পরবর্তী-গুপ্তদের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে (এর পূর্বে না হলেও) গৌড় শশাঙ্কের অধীনে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেছিল এবং মগধও তার রাজত্বে এনেছিল। এই স্বাধীন রাজ্যের উত্থান সম্ভবত মহাসেনগুপ্তের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ ছিল। কিছু গবেষকের মতে, মহাসেনগুপ্ত কালচুরি শাসক দ্বারা বিপুলভাবে পরাজিত হয়েছিল। মালবের পরবর্তী-গুপ্তদের রাজধানী উজ্জয়িনী কালচুরি রাজা শঙ্করগণের অধিকারে ছিল এবং মহাসেনগুপ্তের দুই যুব পুত্রকে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের দরবারে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৬.৪ সারাংশ

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে মহাসেনগুপ্তের ইতিহাস সবটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না; তবে প্রাপ্ত তথ্য তা পরবর্তী-গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে গৌড়-মগধের স্বাধীন রাজ্যের উত্থানের ব্যাখ্যা দেয়। এই স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্ক কেন পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মৌখরী রাজা এবং কামরূপের শাসকের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং মালবের রাজা দেবগুপ্তের সাথে একটি জোট গঠন করেছিলেন তাও এটি ব্যাখ্যা করে। অন্য কথায়, ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক ঐতিহ্য সপ্তম শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। তিব্বতি রাজা স্রোং সানের আক্রমণও পূর্ব ভারতের পরবর্তী-গুপ্ত রাজবংশের শক্তিকে দুর্বল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং শশাঙ্ককে পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় উত্থান করতে সাহায্য করেছিল। চালুক্য রাজবংশের রাজা কীর্তিবর্মণের বিজয়ের ক্ষেত্রে একই প্রেক্ষিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পাওয়া যেতে পারে। তিনি দাবি করেন যে তিনি অঙ্গ, বঙ্গ এবং মগধ জয় করেছেন এবং এটি সত্য হলে, গৌড় ও মগধে পরবর্তী-গুপ্ত শাসকদের অবস্থানকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছে। শশাঙ্ক হয়তো এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

৬.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. গুপ্ত-পরবর্তী সময়ে গৌড়ের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. পরবর্তী-গুপ্তদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৬.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

একক ৭ ❑ শশাঙ্ক

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ ভূমিকা

৭.২ শশাঙ্কের প্রাথমিক জীবন

৭.৩ শশাঙ্কের ক্ষমতায় উত্থান

৭.৪ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ

৭.৫ শশাঙ্ক এবং বৌদ্ধধর্ম

৭.৬ সারাংশ : শশাঙ্কের মূল্যায়ন

৭.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৭.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- শশাঙ্কের শাসনের চারটি দিক এই এককে আলোচিত হবে :
  - ☞ বাংলার শাসক হিসেবে শশাঙ্কের উত্থান
  - ☞ শশাঙ্কের শাসনে বাংলার ভৌমিক বিস্তার
  - ☞ শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক
  - ☞ শশাঙ্কের শাসনে বাংলার ঐতিহাসিক বিবর্তন

৭.১ ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের উত্থান একটি বিশেষ পর্যায়। প্রাক্-শশাঙ্ক পর্যায়ে পরবর্তী-গুপ্ত শাসকদের আধিপত্যের অধীনে গৌড় শক্তি ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল। মৌখরী রাজা ঈশানবর্মণ গৌড়দের পরাজিত করেছিলেন এবং তাদের বাধ্য করেছিলেন বলে কথিত আছে। স্পষ্টতই গৌড় আক্রমণ এবং

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof \ (Dt. 18.03.2025)

গৌড়ের পরাজয় ছিল মৌখরী ও গুপ্তদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার একটি পর্ব, যেহেতু গৌড় গুপ্তদের অধীনে ছিল। ঈশানবর্মণের উত্তরসূরি সর্ববর্মণ এবং অবন্তীবর্মণ সম্ভবত মগধের কিছু অংশ জয় করেছিলেন এবং কিছু গবেষকের মতে, এর পরেই গুপ্তরা মগধ এবং গৌড় উভয়ই ছেড়ে মালবে চলে আসেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস যাই হোক না কেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ অবধি, গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের শাসন গৌড়, মগধ এবং ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মৌখরী ও গুপ্তদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা, দক্ষিণ থেকে চালুক্য এবং উত্তর থেকে তিব্বতের আক্রমণ পরবর্তী-গুপ্ত শাসকদের মগধ ও গৌড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ খুব দুর্বল করে তোলে এবং মালবে সরে যেতে বাধ্য হয়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুবিধা নিয়েছিলেন শশাঙ্ক, যিনি গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

৭.২ শশাঙ্কের প্রাথমিক জীবন

শশাঙ্কের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুব কম তথ্যই জানা যায়। দেখা যাচ্ছে যে তিনি কর্ণসুবর্ণের গৌড় রাজার অধীনে রোহতাসগড়ের একজন প্রধান (মহাসামন্ত) হিসাবে কিছুকাল শাসন করেছিলেন, যিনি সম্ভবত মৌখরী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাইহোক, কর্ণসুবর্ণের আরেক রাজা জয়নাগকে শশাঙ্কের সময়ের কাছাকাছি বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী এবং বিখ্যাত নগরটি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহার বা আধুনিক রাঙ্গামাটির খননকৃত স্থান রাজবাড়িডাঙ্গার কাছে চিরুটি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে অবস্থিত ছিল। শিলালিপি এবং সাহিত্যের বিবরণে শশাঙ্ককে গৌড়ের শাসক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে গৌড় হল পদ্মা নদী ও বর্ধমান অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটি অনেক বিস্তৃত এলাকায় প্রসারিত হয়। কারুর কারুর মতে, বঙ্গদেশ থেকে সম্ভবত উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর পর্যন্ত শশাঙ্কের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এটি অসম্ভব নয় যে লেখক শশাঙ্কের রাজ্যের কথা মাথায় রেখে গৌড় দেশের সম্প্রসারণ বর্ণনা করেছিলেন, যা উড়িষ্যার একটি অংশতেও বিস্তৃত দিল।

৭.৩ শশাঙ্কের ক্ষমতায় উত্থান

বাংলার রাজাদের মধ্যে শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম সম্পূর্ণ সার্বভৌম শাসক এবং তিনি বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেন। শশাঙ্ক কখন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তার সঠিক সময় ও তারিখ অবশ্য নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। রোহতাসগড় শিলালিপিতে একজন শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কের উল্লেখ আছে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে শশাঙ্ক মূলত একজন মহাসামন্ত, অর্থাৎ সামন্ত প্রধান। কিন্তু তিনি মৌখরী বা গুপ্তদের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

কিন্তু পরবর্তী-গুপ্তদের মহাসেনগুপ্ত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় ও মগধের অধিকারী ছিলেন তা এই

ধারণাকে উত্থাপন করে যে শশাঙ্ক গুপ্তদের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন। যাইহোক, সাধারণভাবে একমত যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে গৌড়ের স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়েছিল। শশাঙ্ক কনৌজের মৌখরী এবং কামরূপ রাজ্যের সাথে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এটি এই সিদ্ধান্তের দিকেও ইঙ্গিত করে যে গুপ্তদের উত্তরাধিকারী হিসাবে শশাঙ্ক কনৌজ এবং কামরূপের রাজবংশের সাথে অবিরাম সংগ্রামে অবরুদ্ধ ছিলেন। কিছু ঐতিহাসিকের মতে শশাঙ্কের নাম নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি গুপ্ত বংশের বংশধর ছিলেন। কিন্তু এই মতামত অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

বানভট্ট এবং হিউয়েন সাং শশাঙ্ককে গৌড়ের রাজা বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাজধানীর নামকরণ করেছেন কর্ণসুবর্ণ। তবে তার রাজধানীর প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। এটি এখন বহরমপুর থেকে ছয় মাইল দূরে রাঙ্গামাটি নামে একটি স্থানে।

শশাঙ্কের উত্থানের আগে মানা রাজবংশ (Mana dynasty) বিহারের মেদিনীপুর এবং গয়া জেলার মধ্যে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই রাজবংশ উড়িষ্যা দখল করে। শশাঙ্ক শম্ভুজ বা তার উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করেন এবং দণ্ডভুক্তি অর্থাৎ মেদিনীপুর, উৎকল, অর্থাৎ উড়িষ্যা এবং কাঙ্গোদ অর্থাৎ দক্ষিণ উড়িষ্যা দখল করেন। শৈলোৎভব রাজবংশের রাজারা শশাঙ্কের অধিপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং কাঙ্গোদ অর্থাৎ দক্ষিণ উড়িষ্যার উপর শশাঙ্ক আধিপত্য স্থাপন করেন।

দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত বঙ্গ রাজ্যও শশাঙ্কের আধিপত্য স্বীকার করেছিল। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। শশাঙ্ক গৌড়কে শুধুমাত্র একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে গড়ে তোলেননি বরং দক্ষিণ দিকে গঞ্জাম পর্যন্ত, সমগ্র বাংলা, মগধ ও বারাণসী পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। শশাঙ্ক যখন মৌখরীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, তখন থানেশ্বরের পুষ্যভূতিরা তার বিরোধিতা করেন, কারণ মৌখরী রাজা গ্রহবর্মণ ছিলেন প্রভাকরবর্ধনের জামাতা।

মালবের দেবগুপ্তে শশাঙ্কের এক বন্ধু ও মিত্র ছিল। দেবগুপ্ত গ্রহবর্মণের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ছিলেন। বারাণসী জয় করার পর শশাঙ্ক যেমন কনৌজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, দেবগুপ্তও কনৌজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয় এবং তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারের আনন্দ শীঘ্রই এই খবরে বিঘ্নিত হয়েছিল যে রাজ্যবর্ধনের বোন, রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মণ, দেবগুপ্তের কাছে পরাজিত এবং নিহত হয়েছেন। রাজ্যশ্রীকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। রাজ্যবর্ধন তার ভাই হর্ষবর্ধনের হাতে তার রাজ্যের ভার অর্পণ করেন এবং দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যশ্রীর মুক্তির জন্য অগ্রসর হন।

ইতিমধ্যে শশাঙ্কও থানেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। রাজ্যবর্ধন ও দেবগুপ্তের মধ্যে সংঘর্ষে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন। কনৌজের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘাত হয় এবং শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত হন।

শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের পরাজয় ও মৃত্যু বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গল্পের জন্ম দেয়। এর মধ্যে বানভট্টের *হর্ষচরিত* এবং হিউয়েন সাং-এর আখ্যানে উল্লিখিত এবং উল্লেখ্যের যোগ্য। বানভট্টের মতে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে তার শিবিরে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে একা পেয়ে হত্যা করে। হিউয়েন সাং-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে শশাঙ্ক তার মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজ্যবর্ধনকে তাঁর শিবিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে হত্যা করেছিলেন। এর কারণ তাঁকে মন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল যে যতদিন রাজ্যবর্ধনের মতো একজন সৎ ও ধার্মিক রাজা বেঁচে থাকবেন ততদিন গৌড় রাজ্যের মহিমা লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। হর্ষবর্ধনের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, সত্য রক্ষার জন্য রাজ্যবর্ধন তার শত্রুর শিবিরে প্রাণ হারান। এ ধরনের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য থেকে সত্য বের করা কঠিন।

বানভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি; হিউয়েন সাং শশাঙ্ক-র বৌদ্ধ বিদ্বেষের জন্য তাঁকে অপছন্দ করতেন। সম্ভবত তাঁদের বর্ণনায় ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের শিলালিপিতে বলা হয়েছে সত্যরক্ষার্থে রাজ্যবর্ধন শত্রুশিবিরে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। শশাঙ্ক যে বিশ্বাসঘাতক আচরণ করেছিলেন তা কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়নি। এই সবের জন্য, আধুনিক ইতিহাসবিদরা শশাঙ্ককে রাজ্যবর্ধনের বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারী হিসাবে কলঙ্কিত করতে নারাজ।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করেন (হর্ষচরিত অনুযায়ী) যে তিনি পৃথিবীকে গৌড়শূন্য করবেন, অন্যথায় তিনি নিজেকে পুড়িয়ে মারা হবে। তারপরে তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু পথে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর বোন রাজ্যশ্রী দেবগুপ্তের কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তাঁর সেনাপতি ভণ্ডীর কাছে তাঁর সেনাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে রাজ্যশ্রীর সন্ধানে চলে যান।

ইতিমধ্যে কামরূপের ভাস্করবর্মণ শশাঙ্কের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে হর্ষবর্ধনের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মৈত্রীতে প্রবেশ করেন। হর্ষবর্ধন কোনো যুদ্ধে শশাঙ্ককে পরাজিত করতে সফল হয়েছিল কিনা তা *মঞ্জুশ্রীমুলকল্প*, একটি বৌদ্ধ গ্রন্থ, যেখানে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করেছিলেন বলে বলা হয়েছে, তা ব্যতীত কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এই গ্রন্থটিতে শশাঙ্কর পরাস্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে। আরও, হিউয়েন সাং-এর বক্তব্য যে শশাঙ্ক বৌদ্ধদের নিপীড়ন করেছিলেন; মঞ্জুশ্রীমুলককল্পের মতে বোধিবৃক্ষ কেটে, বোধগয়ার পাশে একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন যার ফলে তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে এগুলোকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন। এগুলো বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত গল্পের চেয়ে কম বা কম কিছু ছিল না। বৌদ্ধ গ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য উল্লেখ রয়েছে যে, হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের অধীনে বর্বর দেশে যথাযথ সম্মান পাননি এবং ফিরে আসেন। এই তথ্য থেকে এটা বলা যায় না

যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের হাতে শশাঙ্কের পরাজয় সম্পর্কে বানভট্টের হর্ষচরিতে একটি শব্দও ছিল না। এই উল্লেখযোগ্য বাদ পড়া প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সফল ছিলেন না।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে খুব বেশি সফল ছিলেন না তা শশাঙ্কের তিনটি শিলালিপি দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এই শিলালিপিগুলি এই ক্ষেত্রে বলা যায় হর্ষবর্ধনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়নি। দেখায় যে তিনি ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর অঞ্চলগুলির অধিকারে ছিলেন। রশেচন্দ্র মজুমদারের মতে, ৬৩৭ খ্রি:-এর কিছু আগে শশাঙ্ক-র মৃত্যু হয় এবং খুব সম্ভবত মৃত্যুকাল পর্যন্ত গৌড়ে, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গদের উপর তাঁর আধিপত্য ছিল। রাজবংশের একজন রাজা শশাঙ্কের সামন্ত ছিলেন।

৭.৪ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ

শশাঙ্ক প্রথমে গৌড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মগধে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। সেই সময়ে মগধ মৌখরী শাসনের অধীনে ছিল এবং শশাঙ্ক আবার এটিকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। শশাঙ্ক ছাড়া আর কেউ মগধের মৌখরী শাসকদের পরাজিত করতে পারেনি। এরপর, তিনি ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এবং বিহারে তার রাজ্য সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করেন। সাধারণভাবে শশাঙ্ক গৌড়ের অধিপতি বলে পরিচিত; কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য গৌড়ের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। তার রাজত্বের শেষের দিকে, তার রাজ্য বঙ্গ থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পূর্বে, তার রাজ্য কামরূপের সীমানায় ছিল।

৭.৫ শশাঙ্ক এবং বৌদ্ধধর্ম

শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। দ্বাদশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শশাঙ্ক বাংলার বৌদ্ধ স্তূপ ধ্বংস করেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের নিপীড়ক ছিলেন। শশাঙ্ক বোধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে যেখানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পেয়েছিলেন সেই বোধি গাছটি কেটেছিলেন বলে খ্যাতি রয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই বিবরণটি সন্দেহজনক কারণ এটি কথিত নিপীড়নের কয়েক শতাব্দী পরে লেখা হয়েছিল, এবং এটি "এই বইতে লিপিবদ্ধ বিবৃতিগুলিকে ঐতিহাসিক হিসাবে গ্রহণ করা নির্ভরযোগ্য নয়"। রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে, দ্বাদশ শতাব্দীর এই বৌদ্ধ লেখক শশাঙ্ক সম্পর্কে কোনো খারাপ অনুভূতি লালন করেছিলেন বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই এবং সপ্তম শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তিনি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি যদি একমত হয় যে তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন না, তবুও বৌদ্ধদের প্রতি তার নিপীড়ন তথ্য দ্বারা প্রকাশ পায় না। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ এই সত্যটি প্রকাশ করে। কারণ, হিউয়েন

সাং থেকে আমরা জানতে পারি যে কর্ণসুবর্ণ এবং শশাঙ্কের রাজ্যের অন্যান্য অংশে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচলন দেখেছিলেন। শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার চালাতেন, তাহলে তার রাজধানীসহ তার রাজত্বের সব অংশে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব কিভাবে পাওয়া যেত?

৭.৬ সারাংশ : শশাঙ্কের মূল্যায়ন

বাঙালি ও বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি সম্মানের স্থান দখল করে আছেন। তিনিই সর্বপ্রথম আর্যাবর্তে বাঙালি সাম্রাজ্যের ধারণাটি উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর জীবনকালে তাঁর ধারণাটি অনেকাংশে সফল হয়েছিল। তিনি গৌড়কে গুপ্তদের আধিপত্য থেকে স্বাধীন করে একটি সার্বভৌম রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি তার কর্তৃত্ব ছড়িয়ে দেন দণ্ডভুক্তি সহ সমগ্র বাংলায়, অর্থাৎ মেদিনীপুর, মগধ, উৎকল, কঙ্গোদ এবং বারাণসীতেও। তিনি কনৌজ এবং থানেশ্বরের উপর তার দাবি তুলেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। হর্ষবর্ধন তার জীবদ্দশায় তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। শশাঙ্কের কূটনৈতিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি কনৌজের মৌখরীদের বিরুদ্ধে মালবের দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মৈত্রীতে প্রবেশ করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং হিউয়েন সাং-এর বিবরণে শশাঙ্কের চরিত্রের চিত্র তার চরিত্রের সঠিক চিত্র নয়। আধুনিক গবেষণাগুলি শশাঙ্কের চরিত্রে কিছু দিক প্রকাশ করেছে যা বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং হিউয়েন সাং দ্বারা প্রদত্ত বিষয়গুলির সাথে ভিন্ন।

৭.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় শশাঙ্কের কৃতিত্বের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. শশাঙ্ক এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতিদের মধ্যে সংঘাতের উপর সংক্ষেপে লিখুন।

৭.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

সেন, শৈলেন্দ্র নাথ, *প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা*, দিল্লি, ১৯৯৯।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

পর্যায়-৩

পাল সাম্রাজ্য

একক ৮(ক) ☐ পাল সাম্রাজ্য গঠনের পূর্বে বাংলার অবস্থা

গঠন

৮(ক).০ উদ্দেশ্য

৮(ক).১ ভূমিকা

৮(ক).২ গৌড়তন্ত্রের পতন-নৈরাজ্য

৮(ক).৩ মৎস্যনায়ম-খালিমপুর শিলালিপি

৮(ক).৪ মৎস্যন্যায় ইতিহাস রচনা

৮(ক).৫ সারাংশ

৮(ক).৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৮(ক).৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৮(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- শশাঙ্কের সময় থেকে পাল রাজবংশের উত্থান পর্যন্ত বাংলার অবস্থা পর্যালোচনা করা।
- মাৎস্যন্যায়—যা এই পর্বের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-এর প্রকৃতি ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা।

৮(ক).১ ভূমিকা

শশাঙ্কের মৃত্যু বাংলার ভাগ্যাকাশে রাজনৈতিক বিপর্যয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সুদূরপ্রসারী গৌড় সাম্রাজ্যের স্বপ্নই কেবল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় না, কয়েক বছরের মধ্যেই রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণ সহ তাঁর রাজ্য কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের হাতে চলে যায়। যে ঘটনাগুলি এই পতনকে অবশ্যম্ভাবী করেছিল তা জানা যায় না, এবং বাংলার ইতিহাসে এই অস্পষ্ট সময়ের অল্প কিছু ঘটনাই বর্তমানে আমাদের কাছে প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। শশাঙ্কের মৃত্যু তাঁর রাজ্যের সংহতিকে শিথিল করে দেয়, যা উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গকে একত্রিত করেছিল *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প* গ্রন্থে বলা হয়েছে শশাঙ্কর মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof \ (Dt. 18.03.2025)

অভ্যন্তরীণ কলহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শশাঙ্কের পুত্র মানব মাত্র ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন। আনুমানিক ৬৪১ খ্রি: হর্ষবর্ধন মগধ দখল করেন। পরের বছর তিনি উৎকল ও কোঙ্গোদে অভিযান চালান। এই একই সময় কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গৌড় জয় করে কর্ণসুবর্ণে তাঁর জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেন।

এই প্রমাণগুলি ইঙ্গিত করে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তার বিশাল আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং এর বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। এটি তার আজীবন শত্রু ভাস্করবর্মণ এবং হর্ষবর্ধনকে প্রয়োজনীয় সুযোগ দিয়েছিল যারা যথাক্রমে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে শশাঙ্কের রাজত্ব জয় করেছিল।

৮(ক).২ গৌড়তন্ত্রের পতন-নৈরাজ্য

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কথা সেই বৌদ্ধ রচনা *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে* উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে হয়। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ অনুবাদ করা হয়েছে : 'সোমের মৃত্যুর পর গৌড় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (গৌড়তন্ত্র) পারস্পরিক অবিশ্বাস, অস্ত্রের ব্যবহার ও পারস্পরিক ঈর্ষা প্রধান হয়ে ওঠে—এক সপ্তাহের জন্য একজন রাজা; এক মাসের জন্য আরেকটি; তারপর একটি প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থা—গঙ্গার তীরে যেখানে বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষের উপর বসতি তৈরি করা হয়েছিল সেই দেশের প্রতিদিনের অবস্থা হবে। অতএব সোমের (শশাঙ্ক) পুত্র মানব ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করবে।

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি প্রায় নিঃসন্দেহে গৌড়ের রাজা জয়নাগকে নির্দেশ করে এবং একইভাবে সন্দেহ নেই যে তিনি সেই নামের রাজার সাথে চিহ্নিত হবেন যার মুদ্রা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেছে এবং যিনি এটি প্রচলন করেছিলেন; শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের বিজয়ী শিবির থেকে জারি করেছিলেন। *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প* গ্রন্থের সকল তথ্য ঐতিহাসিকভাবে সত্যি নয়, কিন্তু সমকালীন পারিপার্শ্বিক তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে শশাঙ্ক-পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। নৈরাজ্য, বিভ্রান্তি এবং রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সাধারণ চিত্র হর্ষ এবং ভাস্করবর্মণের বিজয় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েছে। জয়নাগের প্রসঙ্গটি উপরে উল্লিখিত অসংখ্য মুদ্রা এবং জয়নাগ নামে একজন রাজার শিলালিপি দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যিনি কর্ণসুবর্ণকে তার রাজধানী হিসাবে শাসন করেছিলেন।

৮(ক).৩ মাৎস্যন্যায়-খালিমপুর শিলালিপি

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এবং পালদের উত্থানের আগে (আনুমানিক ৭৫০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার অবস্থাকে মাৎস্যন্যায় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সমসাময়িক শিলালিপিতে, দ্বিতীয় পাল শাসক ধর্মপালের ৩২ তম বছরের খালিমপুর তাম্রশাসন এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্বাদশ শতকের *রামচরিত* কাব্যে পাল রাজবংশের উত্থানের পূর্বে বাংলার নৈরাজ্যিক অবস্থাকে মাৎস্যন্যায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের লেখক ঘোষণা করেছিলেন যে শশাঙ্কের পরে গৌড় রাজ্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল

এবং তারপরে যিনি রাজা হবেন তিনি এক বছরও শাসন করতে পারবেন না। একই সূত্রে ভারতের পূর্বাঞ্চলে সেই সময়কালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।

উপরোক্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শশাঙ্কের রাজত্বের পরের শতাব্দীতে বাংলায় স্থিতিশীল সরকার খুব কমই দেখা যায়। দেশটি অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষম একটি শক্তিশালী শক্তির অভাবে, যে পরিস্থিতি বিরাজ করে তাকে মাৎস্যন্যায় বলা হয়। আইনবহির্ভূত শক্তিই ছিল একমাত্র শক্তি, এবং সারা দেশ জুড়ে ছিল লাগামহীন, অনিয়ন্ত্রিত শক্তির উন্মাদনা। এই অবস্থার অবসান ঘটাতে গোপাল বাংলার রাজা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং পাল রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

এই নৈরাজ্যের সামাজিক প্রভাবগুলি বোঝার জন্য আমাদের কাছে সরাসরি প্রমাণ নেই। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে পরোক্ষভাবে এটা স্পষ্ট যে শান্তি-শৃঙ্খলার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবনতি ঘটেছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর তাম্রলিপ্ত বন্দরের প্রাধান্য হারানো এই ক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখা যায় যে পাল যুগের মন্দির ও মঠগুলি পূর্ববর্তী গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল। দেখে মনে হবে ধ্বংসটি নৈরাজ্যের যুগের অন্তর্গত। পূর্বে উল্লেখিত বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষের সাথে বিরাজমান নৈরাজ্যের সম্পর্ক থাকতে পারে। একজন শক্তিশালী রাজার অনুপস্থিতিতে সামন্ত প্রভুরা (প্রত্যেকেই স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত), নৈরাজ্য সৃষ্টিতে সহায়ক ছিল। এবং তাদের কয়েকজনের বিচক্ষণতা অবশ্যই অনাচারের রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছে; তাদের মধ্যে কয়েকজন একত্রিত হয়ে গোপালকে ক্ষমতায় আনেন।

৮(ক).৪ মাৎস্যন্যায়-এর ইতিহাসচর্চা

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাঙালি পণ্ডিতরা প্রথম দিকের বাংলার ইতিহাসের উপর অধ্যয়ন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে চালিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বাংলাভাষী জনগণের সাংস্কৃতিক অতীত এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্র অনুসন্ধানে একটি নতুন মাত্রা দেয় যেখানে বাঙালি পরিচয়ের উৎস অনুসন্ধানে প্রসারিত হয়। মগধ থেকে পাল শাসকরা বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব প্রসারিত করেছিলেন এবং বাঙালিদের পরাধীন করেছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, রমাপ্রসাদ চন্দ গোপালকে প্রথম বাঙালি রাজা হিসাবে অভিহিত করেছিলেন যাকে বাঙালি জনগণ অরাজকতার অবসান ঘটাতে নির্বাচিত করেছিলেন এবং তাঁর মতে এটি ছিল 'গৌড় রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন' যা তাঁর কাছে ছিল বাংলার প্রতিনিধি, বাংলার ঐক্যবদ্ধ ভাবমূর্তির চূড়ান্ত পরিণতি। এ. কে. মৈত্রেয়ের লেখায় বাংলার একই চিত্র এবং গোপালকে বাঙালি রাজা হিসেবে দেখার প্রয়াস বিদ্যমান। এটি লামা তারানাথের বাঙ্গালার সমতুল্য ছিল। গোপালের মতো একজন রাজাকে নির্বাচিত করার জন্য সমস্ত স্থানীয় প্রধানদেরই 'সাধারণ কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ' করা উচিত বলে মনে করা হয়, যা তাঁর কাছে 'শুদ্ধতম ধরণের দেশপ্রেম'। এর ফলে সম্মিলিত নীতির উপর

ভিত্তি করে একটি 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে সমস্ত সামন্ত প্রধানগণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত গৌড়েশ্বরের সুরক্ষায় বসবাস করত। অন্য কথায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা জনগণকে একটি আদর্শ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পরিচালিত করেছিল। অধ্যাপক আর. ডি. ব্যানার্জী এর থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে গৌড়-মগধ-বঙ্গকে একসাথে একটি একক হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন যা দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের পরে নৈরাজ্যের মুখোমুখি হয়েছিল। গৌড়ের প্রজাদের দ্বারা গোপাল নির্বাচনের মাধ্যমে এটি শেষ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর. সি. মজুমদারের সম্পাদনায় *বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড (হিন্দু পর্যায়)* প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক আর. সি. মজুমদারও মতামত দিয়েছিলেন যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর 'গৌড়রাষ্ট্র আভ্যন্তরিক কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।' শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের সংহতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁর মতে এটি হিউয়েন সাং-এর বিবরণে পুণ্ড্রবর্ধন এবং কর্ণসুবর্ণকে পৃথক রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও শশাঙ্কের অধীনে এই ধরনের বন্ধনের অস্তিত্ব কোনো তথ্যে কখনোই নির্দেশিত হয়নি। *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে* উত্তরবঙ্গে শশাঙ্কের কর্তৃত্ব সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে, কিন্তু এটি সন্দেহের বাইরে নয়। যাইহোক, তিনিই প্রথম বঙ্গের ইতিহাস আলাদাভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে গৌড়ের ঘটনাগুলির থেকে বঙ্গের ইতিহাস ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একই সময়ে তাদের প্রকৃতি ছিল অভিন্ন কারণ উভয়েই শাসকদের দ্রুত পরিবর্তন এবং বারবার বিদেশি আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছিল। শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণের মৃত্যুর পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষে পূর্ববঙ্গে একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। রমাপ্রসাদ চন্দের মতো তিনিও গোপালের নির্বাচনকে 'একটি জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে অধীনস্থ করার' উদাহরণ হিসাবে দেখেন যদিও স্বীকার করেছেন যে নির্বাচনটি মূলত 'একদল নেতা বা স্বাধীন প্রধানদের' দ্বারা করা হয়েছিল। এইভাবে অষ্টম শতাব্দীর জনগণের মধ্যে এই 'বাংলার' প্রতি আত্মত্যাগ এবং ভালবাসার চেতনা কল্পনা করার জন্য বাংলাকে একক পরিচয় হিসাবে দেখার চেষ্টা করেন। তাদের দ্বারা এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা যা ছিল আদর্শ ধরনের এবং সর্বোপরি একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণকারী শাসকদের জন্য একটি উপযুক্ত সূচনা। এই লেখকদের লেখায় গৌড় সাম্রাজ্যের উচ্চারণ পাওয়া যায়।

ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের শিলালিপিতে মাৎস্যন্যায় শব্দটি পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদরা সাধারণত আরও দুটি তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে এটিকে সমর্থন করে। এগুলি হল বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প* এবং লামা তারানাথের বিবরণ। সাধারণ প্রবণতা হল সেগুলির মধ্যে থাকা বিবৃতিগুলি গ্রহণ করা বা বাতিল করা। তবে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখলে এই গ্রন্থগুলির তথ্যের আনুপাতিক মূল্য বোঝা যাবে।

খলিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় পালরা বাংলার শাসকপদে আসীন হয়েছে। প্রথম পাল রাজা গোপালের বংশ পরিচয় কিছু জানা যায় না। গোপাল ও তাঁর উত্তরপুরুষগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পাল সম্রাটগণের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে গোপালের পিতামহ দয়িতাবিষ্ণু 'সর্ব্ববিদ্যাবিশুদ্ধ' ছিলেন এবং গোপালের পিতা বপ্যট শত্রুকে দমন করেছিলেন এবং তাঁর কীর্তিতে সসাগরা বসুন্ধরা ভূষিত হয়েছিল।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে গোপাল কোনো রাজবংশের সন্তান ছিলেন না; গোপাল সম্ভবত প্রবীণ ও সুনিপুণ যোদ্ধা বলে পরিচিত ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ অর্থাৎ প্রজারা গোপালকে বাংলার রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে গোপাল রাজকীয় ব্যক্তি ছিলেন না এবং সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদারদের বশীভূত করে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। *আর্যমঞ্জুশ্রীমুলকল্পের* সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য সাক্ষ্যগুলি মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় গোপালের সিংহাসনে আসীন হওয়ার পূর্বে বাংলায় এক সার্বিক নৈরাজ্য বর্তমান ছিল। এটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ে অরাজকতা বিরাজ করে এবং এর প্রথম কারণ ছিল একটি স্থিতিশীল প্রশাসনের অনুপস্থিতি।

৮(ক).৫ সারাংশ

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে মাৎস্যান্যায়র সময়কালকে সাধারণ একটি অন্ধকার সময় হিসাবে দেখা হয় যা বাঙালির জীবনকে গ্রাস করেছিল। শব্দটি সাধারণত সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি শশাঙ্কের মৃত্যু থেকে পাল রাজবংশের উত্থানের সময়কালের জন্য প্রয়োগ করা হয়। এই অবস্থা সমগ্র বাংলায় সাধারণভাবে বিরাজ করেছিল বলে মনে করা হয়। একটি স্থিতিশীল সরকারের অনুপস্থিতি এবং বারবার বিদেশি আগ্রাসন এই সময়ের রাজনীতির রূপরেখার প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নৈরাজ্য যে সাধারণ মানুষের জীবনকেও প্রভাবিত করেছে তা বলাই বাহুল্য।

৮(ক).৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. মৎস্যন্যায় একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নৈরাজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা কতটা সঠিক।

৮(ক).৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতীশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

পাল, প্রমোদলাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড-I ও II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

একক ৮(খ) ❑ পালদের উৎপত্তি ও আদি ইতিহাস

গঠন

৮(খ).০ উদ্দেশ্য

৮(খ).১ ভূমিকা

৮(খ).২ গোপাল—বাংলার প্রথম নির্বাচিত শাসক

৮(খ).৩ সারাংশ

৮(খ).৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৮(খ).৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৮(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- প্রাচীন বাংলায় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা পর্যালোচনা করা।
- প্রকৃতিপুঞ্জ বা প্রজাদের দ্বারা বাংলার শাসকপদে গোপালের নির্বাচন ও রাজ্যাভিষেক আলোচনা করা।

৮(খ).১ ভূমিকা

শশাঙ্কের মৃত্যু বাংলায় একটি বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সূচনা করে। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ দেখায় যে শশাঙ্কের মৃত্যু সাম্রাজ্যের বন্ধন শক্তিকে শিথিল করেছিল যে বাংলা অঞ্চলের উত্তর ও পশ্চিম অংশকে একত্রিত করেছিল। বৌদ্ধ রচনা *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প* উল্লেখ করেছে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়তন্ত্র বা গৌড় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। খালিমপুরের শিলালিপি এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতের* মতো সাহিত্য গ্রন্থে এই অবস্থাটিকে মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে। সুতরাং তথ্যের অভাবের জন্য আমাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে শশাঙ্ক-পরবর্তী সময়ে বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল।

এই নৈরাজ্যের সময়কাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শেষ হয়েছিল যখন শ্রী গোপাল

D:\Suvendu\NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof\ (Dt. 18.03.2025)

'প্রকৃতি পুঞ্জ' দ্বারা বাংলার প্রথম জনগণের রাজা নির্বাচিত হন। এইভাবে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিল এক নতুন রাজবংশ। এই নতুন রাজবংশ পাল রাজবংশ নামে পরিচিত।

৮(খ).২ গোপাল—বাংলার প্রথম নির্বাচিত শাসক

বাংলার ইতিহাসে গোপালই প্রথম শাসক যাকে শাসক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল তার নিজের প্রজাদের দ্বারা। তিনি বাংলায় পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং শতাব্দীর দীর্ঘ রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন। বাংলার সিংহাসনে তাঁর আরোহণ বাংলার ইতিহাসে এক যুগের সূচনা করে।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য কালানুক্রম পাওয়া সম্ভব। পালরা দীর্ঘ চারশতক রাজত্ব করেছিল এবং পাল রাজাদের শাসনের কালানুক্রম সুস্পষ্ট। বাংলায় পাল শাসন ও সমকাল সম্পর্কে জানার এইটি একটি বড় সুবিধা যা ঐতিহাসিকরা ব্যবহার করেছেন।

শতাব্দী দীর্ঘ নৈরাজ্য ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বাংলার প্রজাদের মধ্যে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। এত দীর্ঘকাল ধরে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি রাজনৈতিক চেতনা ও আত্মত্যাগের চেতনা গড়ে তুলেছিল যার তুলনা বাংলার ইতিহাসে নেই বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন। সাম্প্রতিক গবেষণায়ও অবশ্য এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। আবদুল মোমিন চৌধুরীর মতে প্রকৃতিপুঞ্জ বা প্রজাদের দ্বারা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গোপাল বাংলার রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন এই ঘটনাক্রম ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে মানা কঠিন। পক্ষান্তরে গোপাল তাঁর অনুগতদের সমর্থন নিয়ে তাঁর বিরোধী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করেন এবং বাংলার রাজা পদে আসীন হন। এটি নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে তৎকালীন বাংলার প্রভাবশালী গোষ্ঠীসমূহের বৃহত্তর অংশ গোপালকে বাংলার রাজা হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। খালিমপুর তাম্রশাসনের শিলালিপিতে সংক্ষেপে ধর্মপালের পূর্বপুরুষদের কথা উল্লেখ আছে। দুর্ভাগ্যবশত গোপালের প্রাথমিক জীবন এবং তার রাজনৈতিক কর্মজীবন সম্পর্কে তথ্যের কোনো সমসাময়িক উৎস নেই। তিনি শুধুমাত্র পরবর্তী সাহিত্যিক সাক্ষ্য এবং বিভিন্ন শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ বংশ তালিকার মাধ্যমে পরিচিত হন।

খালিমপুর তাম্রশাসন অনুসারে গোপাল ছিলেন বপ্যটের পুত্র যিনি 'খণ্ডিতরাতি' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন যার অর্থ শত্রুদের হত্যাকারী। তাঁর পিতামহ ছিলেন দয়িতবিষ্ণু। তিনি 'সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ' নামে পরিচিত ছিলেন। পাল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং বংশবৃত্তান্তের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে উচ্চ বংশের কোনো দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য খুব কম প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এর কারণ প্রাথমিকভাবে পালবংশীয়রা সামাজিকভাবে উচ্চ অবস্থানে ছিল না। তাদের প্রজাদের সমর্থন সম্ভবত তাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু যখন পালদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন পাল শাসকরা দাবি করেন

যে তারা সৌর রাজবংশ থেকে এসেছেন। *রামচরিতে* পাল শাসকদের সৌর রাজবংশের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গোপালের নির্বাচন প্রক্রিয়ার তেমন কোনো উল্লেখ নেই সমসাময়িক লিপিতে নেই। খালিমপুর তাম্রশাসন আমাদের এই ঐতিহাসিক ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়। গোপালের নির্বাচন হয়েছিল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। খালিমপুর তাম্রফলকের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে 'Mātryanyāyam-apotitum prakrtibhir-laksmyāh karangrāhitah। S'ri-Gopāle iti ksitiśa-śirasām-cūdāmanis-tat-sutah। অধ্যাপক কিয়েলহর্ন এইভাবে অনুবাদ করেছেন: 'তাঁর পুত্র ছিলেন রাজাদের মুকুটের রত্ন, মহিমান্বিত গোপাল, যাকে জনগণ ম্যাৎসন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে রাজা করেছিল। উপরোক্ত একটি পাদটীকায়, অধ্যাপক কিলহর্ন যোগ করেছেন: 'গোপালকে জনগণ রাজা বানিয়েছিল এমন একটি অনাচারের অবসান ঘটাতে যেখানে প্রত্যেকেই ছিল তার প্রতিবেশীর শিকার'। 'মাৎস্যন্যায়' শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যার জন্য তিনি কর্তৃত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। দৃশ্যত দেখা যাচ্ছে যে গোপালকে রাজা করা হয়েছিল রাজ্যের নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে। কিন্তু তিনি কাদের দ্বারা নির্বাচিত হলেন তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। খালিমপুর তাম্রফলকের শিলালিপিতে 'প্রকৃতি পুঞ্জ'কে গোপালের নির্বাচক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি প্রজাদের সমগ্র হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং এর ফলে গোপাল নির্বাচিত রাজা ছিলেন যিনি জনগণের সাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই অর্থটি অতি সরলীকরণ বলে মনে হয়। তাই কিছু গবেষকের মতে 'প্রকৃতি' শব্দটিকে একটি প্রযুক্তিগত শব্দ হিসাবে নেওয়া উচিত যার অর্থ প্রধান কর্মকর্তা। কল্‌হনের রাজতরঙ্গিনীতে চিত্রিত জলৌকার নির্বাচনের অধ্যায়ে সাত কর্মকর্তার একটি দলকে প্রকৃতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গোটা রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগকারী কোনো শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকারের অভাবে এই ধরনের নির্বাচন অসম্ভব বলে মনে হয়। যেহেতু আমরা জানি যে গৌড় বা বঙ্গের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল এবং এই অঞ্চলটি অনেকগুলি ছোট বা মাঝারি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাই সরকারী আধিকারিকদের কাউকে কাউকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে। এই বিতর্ক এবং সমর্থনকারী তথ্যের অভাব সত্ত্বেও এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে গোপাল জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল যদিও সম্ভবত নির্বাচনটি মূলত একদল নেতা বা স্বাধীন শাসক প্রধানদের দ্বারা করা হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে গোপাল বা তার পূর্বপুরুষ একজন রাজার সামরিক কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। এই অনুমানের পেছনের কারণ হরিভদ্র ধর্মপাল রচিত *অষ্টসহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার* একটি ভাষ্যে 'রাজভটাদিবংশপতিতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি স্বয়ং ধর্মপালের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। এই রাজার পরিচয় এখনো সঠিকভাবে সম্ভব হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই তাকে সমতট অঞ্চলে শাসনকারী একই নামের রাজা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সম্ভবত সপ্তম শতকের শেষে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পাল শাসকরা কোনো না কোনোভাবে খড়্গ রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্ব বাংলার খড়্গ শাসকরাও পাল শাসকদের মতো বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গোপালের সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল আগে ক্ষমতায়

ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন যে এই সংযোগটি মাতৃকূল থেকেও হতে পারে। তাদের জন্য 'পাতিতা' শব্দের অর্থ মাতৃসূত্র থেকে এসেছে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কেইলহর্ন ইত্যাদি পণ্ডিতরা খালিমপুর তাম্রলিপিতে ধর্মপালের মায়ের রাজপরিবারের কিছু উল্লেখ খুঁজে পেয়েছেন। গোপালের প্রধান রাণী দেদ্দা দেবীকে চন্দ্র, অগ্নি, শিব, কুবের, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর মতো দেবতাদের স্ত্রীদের সাথে তুলনা করা হয়। তুলনামূলক বর্ণনায় কুবেরের স্ত্রীর নাম ভাদ্রের অব্যবহিতা পরে 'ভদ্রাত্মজা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ন এই শ্লোকটি অনুবাদ করার সময় 'ভদ্রাত্মজা'কে দেদ্দাদেবীর উপাধি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভদ্র রাজার 'কন্যা' হিসাবে অনুবাদ করেছিলেন যে ভদ্রকে উপজাতি বা পারিবারিক নাম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

এইভাবে দেখা যাবে যে পাল রাজপরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের কাছে কমই কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। আশ্চর্যজনকভাবে অন্যান্য মধ্যযুগীয় সাক্ষ্যর বিপরীতে, আমরা বেশিরভাগ পাল শিলালিপিতে রাজবংশের কোনো পৌরাণিক বংশধারা খুঁজে পাই না। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোনও সময় গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপাল সম্ভবত একজন সামন্ত-নায়ক ছিলেন, *অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার* হরিভদ্রকৃত টীকায় ধর্মপালকে 'রাজভট্টাদিবংশপতিত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খালিমপুর লিপির একটি শব্দের প্রতি ঐতিহাসিকরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শব্দটি হল 'ভদ্রাত্মজা'। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে এই শব্দটি ধর্মপালের মা দেদ্দাদেবীর বিশেষণ। একাধিক ঐতিহাসিক এই সাক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে পাল বংশীয়রা অভিজাত। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই সাক্ষ্যগুলির কোনোটাই পালবংশীয়দের আভিজাত্য প্রমাণ করে না। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে পাল রাজাদের সূর্যবংশীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার সোঢ্ঢলা কবির উদয়সুন্দরীকথায় পাল রাজাদের সূর্যবংশীয় মান্ধাতা পরিবার-সম্ভূত বলা হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায় এই জাতীয় দাবির পিছনে কোনও সত্য খুঁজে পাননি। সন্ধাকর নন্দীর রামচরিতে, ধর্মপালকে 'সমুদ্রকূলদীপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘনারামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও সমুদ্রের সঙ্গে ধর্মপাল মহিষীর সম্পর্কের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। রামচরিতে ও তারানাথের ইতিহাসে পাল রাজাদের ক্ষত্রিয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাল রাজাদের বর্ণ সম্পর্কে রামচরিতের একটি শ্লোকের ভাষ্য স্পষ্টভাবে বলে যে রামপাল একজন ক্ষত্রিয় রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই এটা সহজেই বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগীয় ভারতে অধিকাংশ শাসক পরিবারের মতো পাল শাসকরাও ক্ষত্রিয় হিসেবে গণ্য হতেন। রাষ্ট্রকূট রাজা এবং কলচুরি রাজাদের সাথে পাল শাসকদের বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। সম্ভবত পাল শাসকদের নিজস্ব সাক্ষ্যে তাদের উৎপত্তি এবং বর্ণের কোনো উল্লেখ না থাকার একটি কারণ হল যে তাঁরা বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাই তাঁরা ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠান বা ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। পাল শাসকদের তাম্রশাসনের শিলালিপিগুলি ভগবান বুদ্ধের আমন্ত্রণ দিয়ে শুরু হয় এবং রাজবংশের অনেক রাজাই বৌদ্ধ ধর্মের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায়।

গোপালের উৎপত্তি ও নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মতোই পালদের জন্মভূমি এবং গোপালের আদি রাজ্যের অবস্থান নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্কের পিছনে প্রধান কারণ হল এই সংক্রান্ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য নেই। মগধ থেকে জারি করা বিভিন্ন পাল শাসকের তাম্রশাসনের অধিকাংশ অনুদান। এটি স্বাভাবিকভাবেই অনেক পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে পালরা মূলত মগধে শাসন করেছিল এবং পরবর্তীকালে বাংলা জয় করেছিল। অন্যদিকে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত বরেন্দ্রকে পাল শাসকদের আদি জন্মভূমি বলে উল্লেখ করেছে। প্রতিহার শাসকের গোয়ালিয়রের শিলালিপিতে ধর্মপালকে বঙ্গপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাদল স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ধর্মপাল ছিলেন পূর্বের প্রথম শাসক যিনি ধীরে ধীরে তার সাম্রাজ্য অঞ্চলকে অন্য দিকে ছড়িয়ে দেন। এই গৌণ প্রমাণগুলি কিছু পণ্ডিতকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে পালদের আদি রাজ্য অবশ্যই বাংলায় স্থাপন করা উচিত।

রামচরিত ও গোয়ালিয়র শিলালিপির বক্তব্যে বৈপরীত্য রয়েছে। রামচরিতে সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রকে পাল শাসকদের আদি ভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে গোয়ালিয়রের শিলালিপিতে বঙ্গকে পাল শাসকদের দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী বাংলার উত্তরাঞ্চলকে বোঝাত। অন্যদিকে বঙ্গ বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে নির্দেশ করে। এই বৈপরীত্য সত্ত্বেও মনে রাখা যেতে পারে যে, বহুবার বঙ্গ সমগ্র বাংলা প্রদেশের নাম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথের বিবরণ বিতর্কের সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর মতে 'গোপাল পুণ্ড্রবর্ধনের কাছে একটি ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ভঙ্গলের (বঙ্গল বা বঙ্গালের) শাসক। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গোপালের আদি রাজ্যের সীমা যা-ই থাকুক না কেন, সমগ্র বাংলার উপর তিনি তাঁর কর্তৃত্ব সংহত করতে সফল হয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

গোপালের শাসনকাল বা তাঁর রাজত্বকালের অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে তথ্যের সামগ্রিক অভাব রয়েছে। গোপালের পরবর্তী বংশধর নারায়ণপাল কর্তৃক জারি করা তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে 'jitva yah ka mak-āri-prabhavam-abhi-bhavam śāśvatim-prāpa śāntim'। এর অর্থ মনে হয় গোপাল অত্যাচারী বা অত্যাচারী শাসকদের আক্রমণকে পরাজিত করে তার রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'কামকারি' অভিব্যক্তির আক্ষরিক অর্থ যারা কোনো নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি অবশ্যই গোপালের রাজত্বের আগে বিরাজমান অরাজকতা ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সময়কালের দিকে। তবে এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে 'কামকারি' অর্থ 'কামরূপের রাজা, যিনি শত্রু'। আবদুল মোমিন চৌধুরীর মতে গোপালের কামরূপ জয়ের তথ্য অনৈতিহাসিক। তার কারণ কামরূপের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে নারায়ণপালের ভাগলপুর অনুশাসন থেকে যেখানে বলা হয়েছে দেবপালের সময় পালেরা কামরূপ জয় করে।

তারানাথের মতে গোপাল পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্য উপযুক্ত সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণ করা যায় না। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প অনুসারে গোপালের রাজত্বকাল ছিল প্রায় সাতাশ বছর।

একটি জটিল মুহূর্তে তাকে সিংহাসনে ডেকে আনার ঘটনাটি দেখায় যে তিনি অবশ্যই বয়সে মোটামুটি প্রবীণ ছিলেন এবং তার পরাক্রম ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প এর মতে গোপাল আশি বছর বয়সে মারা যান।

৮(খ).৩ সারাংশ

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে যদিও গোপালের জীবন বা তার সামরিক কর্মজীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না তবে সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে তার মৃত্যুর সময় তিনি তার পুত্র ধর্মপালকে একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য দান করেছিলেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গোপাল আশি বছর বয়সে মারা যান। তিনি প্রায় সাতাশ বছর বাংলা শাসন করেন। এটি সাধারণত অনুমান করা হয় যে ধর্মপাল ৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। গোপালের রাজ্যের সঠিক সীমানা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তার পুত্র ও উত্তরসূরি ধর্মপাল যে রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি পাল সাম্রাজ্যকে সমসাময়িক ভারতের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে সফল হন।

৮(খ).৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. পালদের উত্থানের পূর্বে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. পাল রাজবংশের উৎপত্তি ও প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৮(খ).৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

পাল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

একক ৯ ❑ পাল সাম্রাজ্য

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ ভূমিকা

৯.২ ধর্মপাল—সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

৯.৩ কনৌজের গুরুত্ব—মহোদয়শ্রী

৯.৪ ধর্মপালের সময় ত্রিপাক্ষিক সংগ্রাম

৯.৫ ধর্মপাল ও বৌদ্ধধর্ম

৯.৬ ধর্মপালের কৃতিত্ব

৯.৭ দেবপাল—একজন প্রকৃত উত্তরসূরি

৯.৮ দেবপাল এবং বৌদ্ধধর্ম

৯.৯ দেবপালের কৃতিত্ব

৯.১০ সারাংশ

৯.১১ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৯.১২ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের প্রসার ও সংহতকরণ বিশ্লেষণ করা।
- পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্রাট যথাক্রমে ধর্মপাল ও দেবপাল এর সময় পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং এই দুই শাসকের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করা।
- বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পাল শাসকদের সম্পর্ক এই এককে আলোচিত হবে।
- ধর্মপাল ও দেবপাল এর মূল্যায়ন করাও এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।

D:\Suvendu\NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof\ (Dt. 18.03.2025)

৯.১ ভূমিকা

পাল রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল বাংলা অঞ্চলে একটি সাম্রাজ্যিক শক্তি হিসাবে ধ্রুপদী যুগের শেষ পর্যায়ে। তারা তথাকথিত বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের বাইরেও বিস্তৃত অঞ্চলের উপর তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিল। সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়েছিল তার শাসক রাজবংশের নামানুসারে, যার শাসকদের নাম ছিল পালাউ প্রত্যয় দিয়ে শেষ হয়, যার অর্থ "রক্ষক"। তারা বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান ও তান্ত্রিক বিচারধারার অনুসারী ছিলেন। তারা ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিক এবং সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী। গোপাল বরেন্দ্র ও বঙ্গে রাজা হয়ে দেশে অন্য যত 'কামকারী' বা যথেচ্ছপরায়ণ বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী সামন্ত বা নায়করা ছিলেন তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন এবং সম্ভবত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাল বংশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। বাংলা থেকে অরাজকতা দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা গোপালের প্রধানতম কীর্তি। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার উভয়ই এই মতের সমর্থক। তিনি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রায় চারশ বছর পরে রচিত *রামচরিত* গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমিকে পালদের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করেন যে পাল শাসকগণ আদিতে বরেন্দ্রর অধিবাসী। গোপালের রাজ্যকালের বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা ভিত্তির উপর পরবর্তী সম্রাট ধর্মপাল পাল শাসনের সাম্রাজ্যিক প্রসার ঘটান।

৯.২ ধর্মপাল—সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা

ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের দ্বিতীয় শাসক এবং বাংলার পাল রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি হিসেবে বিবেচিত। তিনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ও উত্তরসূরি ছিলেন। ধর্মপাল পালদের সাম্রাজ্যিক বিকাশের সূচনা করেন। গোপাল নিঃসন্দেহে একজন ভালো প্রশাসক ছিলেন যিনি বাংলার জনগণকে মাৎস্যন্যায় নামে পরিচিত একটি বিশাল রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যে সামগ্রিক শান্তিপূর্ণ অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হননি। ধর্মপাল তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাই তিনি সহজেই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করতে পারতেন।

ধর্মপাল কখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার তার রাজত্বকাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুমান করেন। দীনেশচন্দ্র সরকারের এর মতে, এটি ছিল ৭৭৫ খ্রি: থেকে ৮১২ খ্রি: এর মধ্যে। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই ধর্মপালকে দুটি শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল—গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূটরা। গুর্জর-প্রতিহাররা রাজপুতানা এবং পশ্চিম-মধ্য ভারতের শাসক ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরা ছিল দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শক্তিশালী শাসক রাজবংশ।

ধর্মপাল ছিলেন প্রতিহার রাজবংশের বৎসরাজের সমসাময়িক যিনি রাজত্ব করেছিলেন ৭৮০ এবং ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

৯.৩ কনৌজের গুরুত্ব—মহোদয়শ্রী

কনৌজ গঙ্গা বাণিজ্য পথে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর এবং রেশম পথের সাথে যুক্ত ছিল। এটি কনৌজকে কৌশলগত এবং বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। এটি উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী রাজধানীও ছিল। আদি মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে, কনৌজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী পুরো সময়টিকে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ যেমন রমেশচন্দ্র মজুমদার, সূর্যনাথ উপেন্দ্র কামাথ, এ.এস. আলটেকার প্রমুখরা কনৌজের রাজকীয় যুগ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এটি সেই সময়ের ভারতে কনৌজের গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটি বিশ্বাস করা হত যে কনৌজের উপর যার নিয়ন্ত্রণ ছিল তার সমগ্র ভারতের উপর এবং সেই যুগের ভারত বলতে আজকের সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে বোঝায়। কনৌজের সিংহাসন বোঝাতে 'মহোদয়শ্রী' শব্দটি প্রচলিত ছিল।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজ তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শীঘ্রই যশোবর্মন এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে, যশোবর্মণের রাজবংশের অবসান ঘটে এবং অযোধ্যার শাসকরা কনৌজ দখল করে। তারা নবম শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত শাসন করেছিল। অযোধ্যার শাসকদের মধ্যে বজ্রযুধই প্রথম। তিনি কাশ্মীরের জয়াপীড় বিনয়াদিত্যকে পরাজিত করেন। পরবর্তী শাসক ছিলেন ইন্দ্রয়ুধ। তার রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট সম্রাট ধ্রুব কনৌজ আক্রমণ করেন। পরে বাংলার ধর্মপালও ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করেন। ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজার পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রকূট শাসক তৃতীয় গোবিন্দ ধর্মপাল ও চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজের সিংহাসন দখল করেন।

৯.৪ ধর্মপালের সময় ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, ভারতের তিনটি প্রধান সাম্রাজ্য যেমন পাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে কনৌজের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। পালরা ভারতের পূর্বাঞ্চল শাসক করত যখন প্রতিহাররা পশ্চিম ভারত (অবন্তী-ঝালোর অঞ্চল) নিয়ন্ত্রণ করত। রাষ্ট্রকূটরা ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে রাজত্ব করত। এই তিনটি রাজবংশের মধ্যে কনৌজের নিয়ন্ত্রণের লড়াই ভারতীয় ইতিহাসে ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম হিসাবে পরিচিত। যুদ্ধ শুরু হয় বৎসরাজ প্রতিহারের আমলে। তিনি ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ

করেন। তিনি বাংলার পাল রাজা ধর্মপালকে আক্রমণ করেন এবং তাঁকে পরাস্ত করেন। তিনটি শক্তির মধ্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার এবং পালদের মধ্যে লড়াইয়ের প্রধান কারণ ছিল, প্রথমত, এই অঞ্চলের গুজরাট ও মালব নিয়ন্ত্রণ করা। উপকূলের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, তারা কনৌজ দখল করতে চেয়েছিল যা আদি-মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিপত্তির প্রতীক ছিল। গাঙ্গেয় সমভূমির বিশাল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার মতে, হর্ষবর্ধনের সময় থেকে কনৌজ ছিল উত্তর-ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক কারণেও কনৌজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রতিহার শাসক, বৎসরাজ কনৌজ দখল করতে চেয়েছিলেন; ইন্দ্রায়ুধ তখন কনৌজের শাসক ছিলেন। তিনি বৎসরাজের আধিপত্য মেনে নেন। তবে সেই সময়ে, পাল শাসক ধর্মপাল এবং রাষ্ট্রকূট শাসক ধ্রুব সমানভাবে কনৌজ দখল করতে চেয়েছিলেন। বৎসরাজ ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। একই সাথে ধ্রুব উত্তর ভারতে প্রবেশ করেন এবং বৎসরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এছাড়া তিনি পাল শাসক ধর্মপালকে আক্রমণ করেন এবং কনৌজ জয় করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি দক্ষিণ ভারতে ফিরে যান। এটি ধর্মপালকে উত্তর ভারতে প্রশ্নাতীত ক্ষমতা পেতে সাহায্য করেছিল। ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধের ভাই চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন বসিয়েছিলেন। আর্যাবর্তে পাল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধর্মপালকে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কনৌজ দখল করার পর তিনি সিন্ধুনদ ও পাঞ্জাবের উত্তরের হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ধর্মপাল সম্ভবত বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হন। রাষ্ট্রকূটরাজা ধ্রুব-র দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন ধর্মপালকে সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে ভোজ (বর্তমান বেরারের অংশ, প্রাচীন ভোজকটক), মৎস (আলওয়ার এবং জয়পুর ভরতপুরের অংশ), মদ্র (মধ্য-পাঞ্জাব), কুরু (পূর্ব-পাঞ্জাব), যদু (সম্ভবত পাঞ্জাবেরর সিংহপুর, যাদব রাষ্ট্র), যবন (সম্ভবত পাঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিমে সীমান্তের কোনও খণ্ড আরব রাষ্ট্র), অবন্তী (বর্তমান মালব), গান্ধার (পশ্চিমে পাঞ্জাব) এবং কীর (কাংড়া জেলা) জয় করেন। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে পাল আধিপত্য স্থাপিত হয়। পাল সাম্রাজ্যের এই বিস্তারের পরিণতি হল কনৌজের উপর পাল আধিপত্য স্থাপন। ধর্মপাল কনৌজ বা মহোদয়শ্রীর অধিপতি ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন চক্রায়ুধ। নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন যে চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় কনৌজে সকল বিজিত রাজারা সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁরা "ধর্মপালের নিকট 'প্রণতি পরিণত' হন। এই দিগ্বিজয়চক্র উপলক্ষ্যে ধর্মপালের বিজয়ী সেনাদল কেদার, গোকর্ণ ও 'গঙ্গাসমেতাম্বুধি'-তে পূজো সম্পন্ন করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায়ের অনুমান যে কেদার (হিমালয়ের গাড়োয়াল জেলায়) এবং গোকর্ণের (নেপালে, বাগমতী নদীর তীরে) উল্লেখের অর্থ ধর্মপাল নেপাল জয় করেছিলেন। গৌড়রাজ ধর্মপাল যে নেপালের অধিপতি ছিলেন তা স্বয়ম্ভূপুরাণে স্পষ্ট বলা হয়েছে। ধর্মপালের মুঙ্গের লিপির একটি শ্লোকে হিমালয়ের সানুদেশ ধরে তাঁর সমর অভিযানের উল্লেখ ইঙ্গিতে রয়েছে। কোনও কোনও ইতিহাসবিদ 'গঙ্গাসমেতাম্বুধি' নামক স্থানটিকে নেপাল বলে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক রায়ের ধারণা নেপালের অধিকারকে কেন্দ্র করে তৎকালীন তিব্বতরাজ

মু-তিগ্-ব্ৎ সণ্-পো'র সঙ্গে ধর্মপালের সংঘর্ষ হয়েছিল। কারণ নেপাল এই সময় তিব্বতের অধীনস্ত ছিল। একাদশ শতকে রচিত সোঢ্ঢল কবির উদয়সুন্দরীকথাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তর-ভারতে ধর্মপালের সাম্রাজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে ধর্মপালকে 'উত্তরপথস্বামী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই সকল বিজিত রাজ্যসমূহকে, যারা ধর্মপালের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, কেন্দ্রীয়ভাবে পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নিজ নিজ রাজ্যে তাঁরা স্বাধীন নরপতি রূপেই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মপালের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে হত।

ধর্মপালের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করার প্রতীকী অনুষ্ঠান হয়েছিল কনৌজে। ধর্মপাল যে আর্যাবর্তের সার্বভৌম শাসক তা এই অনুষ্ঠানে ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছিল। এই রাজদরবারে আর্যাবর্তের বহু সামন্ত নরপতি উপস্থিত হয়ে ধর্মপালের সার্বভৌমত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেন। খালিমপুর তাম্রশাসনে এই ঘটনা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হয়েছে, "তিনি মনোহর ভ্রুভঙ্গী-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের (সামন্ত?) নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।" (তথ্যসূত্র : রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (প্রাচীন যুগ)*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. : ৫৭)।

আধুনিক ঐতিহাসিকবৃন্দ ধর্মপালের এই সামরিক বিজয় অভিযান সম্পর্কে এতটা নিঃসংশয় নন। আবদুল মোমিন চৌধুরীর মতে খালিমপুর তাম্রশাসনকে আক্ষরিক অর্থে পাঠ করার জন্য ধর্মপালের কীর্তি সম্পর্কে এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ধর্মপাল যদি এতটাই শক্তিশালী হতেন তাহলে ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের কাছে পরাস্ত হতেন না এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতেন না। অধ্যাপক চৌধুরী আরো মনে করিয়ে দিয়েছেন যদি ধর্মপাল প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ আর্যাবর্তে আধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন তাহলে সেই ঘটনাক্রমের উল্লেখ শিলালিপি বা তাম্রশাসনে অনেক প্রত্যক্ষভাবে থাকত। ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে ধর্মপাল কিয়দংশে সফল হয়েছিলেন; কিন্তু এই সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর সামরিক কীর্তি প্রতিহার ও রাষ্টকূটদের দ্বারা ব্যাহত হয়। ধর্মপালের রাজদরবারের কবিদের বিবরণ এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই ঐতিহাসিক আবদুল মোমিন চৌধুরীর অনুমান।

বৎসরাজের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট। তিনি আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে তার শক্তি সংহত করেন এবং তারপর কনৌজ আক্রমণ করেন। তিনি চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন এবং কনৌজ দখল করেন। এমনকি তিনি ধর্মপালকে আক্রমণ করেন, তাকে পরাজিত করেন এবং বিহারের মুঙ্গের পর্যন্ত তার অঞ্চলে প্রবেশ করেন। রাষ্ট্রকূট শাসক তৃতীয় গোবিন্দও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন। তিনি চক্রায়ুধ ও ধর্মপালের সাহায্যে দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। চক্রায়ুধ এবং ধর্মপাল তার আধিপত্য মেনে নেন এবং কনৌজ তৃতীয় গোবিন্দের অধীনস্ত হয়।

তৃতীয় গোবিন্দ শীঘ্রই দক্ষিণে ফিরে যান যা আবার কনৌজ দখলের জন্য প্রতিহার এবং পালদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করে। সম্ভবত, তারপরে কনৌজ দ্বিতীয় নাগভট্টের দখলে ছিল।

৯.৫ ধর্মপাল এবং বৌদ্ধধর্ম

ধর্মপাল ব্যক্তিগতভাবে মহাযানবাদের অনুসারী ছিলেন। তাই তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম বিপুল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্মের একটি মহান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে বিশাল সোমপুর মহাবিহার নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত তারানাথও তাঁকে ৫০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ লেখক হরিভদ্রকে পৃষ্ঠপোষকতা করার কৃতিত্ব দেন। বুটন রিনচেন ড্রুব ধর্মপালকে উদ্দান্দাপুরায় (ওদন্তপুরী) মঠ নির্মাণের কৃতিত্ব দেন, যদিও অন্যান্য তিব্বতি বিবরণ যেমন তারানাথের বিবরণে বলা হয়েছে যে এটি জাদুকরীভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং তারপর দেবপালকে অর্পণ করা হয়েছিল।

বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে তার কোনো শত্রুতা ছিল না। শিলালিপি থেকে দেখা যায় যে তিনি মন্দিরের জন্য বেশ কিছু জমি মঞ্জুর করেছিলেন।

৯.৬ ধর্মপালের কৃতিত্ব

ধর্মপাল নিঃসন্দেহে একজন মহান শাসক এবং একজন ভালো প্রশাসক ছিলেন। এটা তার সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যিক উপাধি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' থেকে অনুমান করা যায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল অসাধারণ। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর পিতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট রাজ্য ছিল। কিন্তু তাঁর সামরিক দক্ষতা এবং কূটনৈতিক কৌশল তাকে উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল করেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্রাট ও শাসক হিসেবে ধর্মপালের কৃতিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মপালের সাময়িক শক্তির কারণে বাংলায় যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয় তার তুলনা পাওয়া কঠিন। সামান্য পঞ্চাশ বছর আগেও যে দেশ অরাজক অবস্থায় ছিল, কোনও কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না ও সমগ্র সমাজে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল, ধর্মপালের কৃতিত্বে সেই ভূখণ্ড সমগ্র আর্যাবর্তে প্রভূত্ব বিস্তার করেছিল। অধ্যাপক মজুমদার ধর্মপালের নেতৃত্বে পাল রাজবংশের এই উত্থানের প্রশ্নকে বাঙালির নতুন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত বলে চিহ্নিত করেছেন। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এই জাতীয় জীবন প্রধানত আত্মবিকাশ করেছিল বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন। তাঁর ভাষায়,

"পালরাজগণের চারিশত বর্ষব্যাপী রাজ্যকাল বাঙ্গালী জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্ম পালের রাজ্য বাঙ্গালীর জীবন প্রভাবিত"।

৯.৭ দেবপাল—একজন প্রকৃত উত্তরসূরি

দেবপাল ছিলেন পাল বংশের তৃতীয় শাসক। দেবপাল রাজবংশের সম্প্রসারণকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখতে সফল হন। ধর্মপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী, দেবপাল দীর্ঘ রাজত্ব উপভোগ করেছিলেন। তিনি তার পিতার মৃত্যুর পর প্রায় ৮১০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার শাসন অব্যাহত রাখেন। তাঁর পিতা ধর্মপালের মতো দেবপালও 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাধিরাজ' রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তার এই উপাধির থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁর পিতার মতো দেবপালের দক্ষতা এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যিক গুণাবলী ছিল। সমসাময়িক এবং পরবর্তী শিলালিপি এবং সাহিত্যের সূত্রগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে দেবপাল শুধুমাত্র তার পিতার সাম্রাজ্যকে অক্ষত রাখতেই সফল ছিলেন না বরং এর সীমানা আরও প্রসারিত করতেও সফল হয়েছিলেন। এইভাবে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি তার পিতা ধর্মপালের প্রকৃত উত্তরসূরি ছিলেন।

দেবপাল প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে পাল আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। রক্ত ও লৌহর নীতির দ্বারা, দেবপাল তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশাল রাজ্যটিকে ধরে রেখেছিলেন এবং তার পিতার বিশাল সাম্রাজ্যে কিছু সংযোজনও করেছিলেন। বাদল স্তম্ভের শিলালিপি তাঁকে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু হিসাবে বর্ণনা করে। তার রাজত্বের দীর্ঘ সময়কাল প্রাগজ্যোতিষ, উৎকল, হুণ, গুর্জর এবং দ্রাবিড়দের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ধারাবাহিকতায় চিহ্নিত ছিল।

নারায়ণপালের বাদল স্তম্ভের শিলালিপিতে দেখানো হয়েছে যে দেবপালের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দর্ভপাণি এবং তাঁর পৌত্র কেদার মিশ্র দেবপালের রাজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ছিলেন। বাদল স্তম্ভের শিলালিপিতেও দেখানো হয়েছে যে কীভাবে দর্ভপাণি তার কূটনীতি ব্যবহার করে দেবপালকে সমগ্র উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু বানিয়েছিলেন। দেবপাল উৎকল, হুণ ও গুর্জরদের জয় করেছিলেন। তিনি সীমান্ত রাজ্য জয় করে তাঁর পিতার সাম্রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছিলেন। তিনি হিংস্র উপজাতি খাস, লতাদেরও জয় করেছিলেন এবং তাদের রাজ্য দখল করেছিলেন। পূর্বে প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপ রাজারা তাঁর সামন্ত ছিল। দক্ষিণে, উৎকলের রাজা একটি যুদ্ধে পরাজিত হন এবং দেবপালের ভাই ও সেনাপতি জয়পাল প্রদেশটি দখল করেন। উৎকলের (বর্তমান ওড়িশা) রাজা শিব কারাও তাঁর সামন্ত হয়েছিলেন। বাদল স্তম্ভের শিলালিপির সংস্করণ যে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

দেবপাল তার ভাই এবং সেনাপতি জয়পালের অধীনে দুটি সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন, যিনি ছিলেন ধর্মপালের ছোট ভাই ভাকপালের পুত্র। এই অভিযানের ফলে প্রাগজ্যোতিষ এর রাজা (বর্তমান

আসাম) রাজা যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করেন। উৎকলের (বর্তমান উড়িষ্যা) রাজাও যুদ্ধ করতে সক্ষম হননি তাই তিনি তার রাজধানী শহর থেকে পালিয়ে যান। এভাবে উড়িষ্যাও দেবপালের সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

বাদল স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখিত কম্বোজের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কম্বোজ নামের একটি প্রাচীন দেশ বর্তমানে আফগানিস্তান অবস্থিত ছিল, তবে দেবপালের সাম্রাজ্য এতদূর বিস্তৃত ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। কম্বোজ, এই শিলালিপিতে, উত্তর ভারতে প্রবেশকারী কম্বোজ উপজাতিকে নির্দেশ করতে পারে। মুঙ্গের তাম্রশাসন নির্দেশ করে যে পালরা কম্বোজদের কাজ থেকে তাদের যুদ্ধ ঘোড়া কিনত এবং পাল সশস্ত্র বাহিনীতে একটি কম্বোজ অশ্বারোহী বাহিনী থাকতে পারে। নালন্দার মঠ হিসেবে নিযুক্ত একজন পণ্ডিত বীরদেবকে নগরহারার নাগরিক (আধুনিক জালালাবাদের সাথে পরিচিত) বলে মনে করা হয়। এটি কিছু গবেষকদের অনুমান করতে প্ররোচিত করেছে যে দেবপাল প্রকৃতপক্ষে বর্তমান আফগানিস্তানে একটি সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন, যে সময়ে তিনি বীরদেবের সাথে দেখা করেছিলেন। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে দেবপাল উত্তর-পশ্চিমের আরব শাসকদের পরাজিত করেছিলেন। হুন বলতে সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি রাজ্যকে বোঝায়।

বাদল স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লিখিত ''গুর্জরস'' শব্দটি গুর্জর-প্রতিহারদের বোঝায় এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা পাল শাসকদের পুরানো শত্রু ছিল। দেবপালের রাজত্বকালে প্রতিহারদের নেতৃত্বে ছিলেন মিহিরভোজ। তার পিতার মতো, দেবপালও তার রাজত্বের প্রথম ভাগে প্রতিহারদের বৈরী কার্যকলাপ থেকে কিছুটা অবকাশ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। যদিও একটি জৈন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিহার রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং কনৌজ দখল করেছিলেন কিন্তু বেশিরভাগ পণ্ডিত এটিকে সন্দেহজনক মনে করেন। এমনকি যদি তিনি তা করেন তবে সম্ভবত ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর খুব বেশি দিন ছিল না। দ্বিতীয় নাগভট্টের পর প্রতিহার সিংহাসনে আসীন হন রামভদ্র। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে নিদারুণ পরাজয়ের শক্তিক্ষয় হয়েছিল। প্রতিহারবংশের সমসাময়িক লিপি থেকে স্পষ্ট যে রামভদ্র শত্রুশক্তির দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। মিহিরভোজ যখন সিংহাসন আরোহণ করেন তখন তিনি সাম্রাজ্যকে নতুন শক্তি যোগাতে সক্ষম হন। বরাহ এবং দৌলতপুরের তাম্রশাসনের শিলালিপিতে তার পিতার রাজত্বকালে হারিয়ে যাওয়া কিছু এলাকা পুনরুদ্ধারে তাঁর সাফল্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই সাফল্য ছিল স্বল্পস্থায়ী। নবম শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের দিকে মিহিরভোজ রাষ্ট্রকূট শক্তির কাছে পরাজিত হন। বাদল স্তম্ভের শিলালিপি অনুসারে গুর্জরদের প্রভুর অহংকার দেবপাল দ্বারা নিবারণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁর মন্ত্রী কেদারমিশ্র। এইভাবে দেবপালের দীর্ঘ রাজত্বকালে স্বল্প সময়ের সমস্যা সত্ত্বেও প্রতিহারদের দুর্বল করে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

''দ্রাবিড়'' শব্দটি সাধারণত রাষ্ট্রকূটদের একটি উল্লেখ বলে মনে করা হয়। তারা পাল রাজবংশের বংশগত শত্রুও ছিল। দেবপালের সময়ে রাষ্ট্রকূট বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন অমোঘবর্ষ। যদিও এই দ্বন্দ্বের খুব বেশি বিশদ বিবরণ নেই কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে দেবপাল তার পিতার চেয়ে বেশি সফল

ছিলেন বলে অনুমান করা ভুল হবে না। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে দ্রাবিড় শব্দটি রাষ্ট্রকূটদের নির্দেশ করে না। এটি পাণ্ড্য রাজা শ্রীমার শ্রীবল্লভকে নির্দেশ করতে পারে যার রাজত্বকাল ছিল ৮১৫ খ্রি: থেকে ৮৬২ খ্রি:। তবে, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে দেবপালের কোনো অভিযানের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। যাই হোক না কেন, দক্ষিণে তার বিজয় ছিল অস্থায়ী এবং তার আধিপত্য প্রধানত উত্তরে ছিল। দেবপালও তাঁর পিতা ধর্মপালের মতো বাংলা ও বিহারের বাইরের কোনো অঞ্চলে সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেননি। বাকি সাম্রাজ্য অঞ্চলগুলি সম্ভবত শাসকদের দ্বারা শাসিত ছিল যারা পাল শাসকের আধিপত্য স্বীকার করেছিল।

৯.৮ দেবপাল এবং বৌদ্ধধর্ম

দেবপাল ছিলেন বৌদ্ধধর্মের একজন নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী এবং কট্টর পৃষ্ঠপোষক। তিনি মগধে বহু মন্দির ও মঠ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি উদ্দন্তপুরায় (ওদন্তপুরী) বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বুটন রিনচেন ড্রুব তার পিতা ধর্মপালকে মঠটি নির্মাণের জন্য কৃতিত্ব দেন, যদিও অন্যান্য তিব্বতি বিবরণ যেমন তারানাথের বিবরণে বলা হয়েছে যে এটি জাদুকরীভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং তারপর দেবপালকে অর্পণ করা হয়েছিল। সুশাসক ও ধর্মানুরাগী হিসেবে ভারতের বাইরেও দেবপালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় শাসক মহারাজ বালপুত্রদেব তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন। বালপুত্রদেব নালন্দা বিহারে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি পাল সম্রাট দেবপালের কাছে পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করে এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বৌদ্ধ কবি বজ্রদত্ত (লোকেশ্বরশতকের লেখক), দেবপালের রাজ দরবারের সদস্য ছিলেন।

৯.৯ দেবপালের কৃতিত্ব

দেবপাল একজন মহান বিজয়ী হওয়ার পাশাপাশি সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বাংলা সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেবপালকে কার্যত উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি পাল সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে (কামরূপ ও উৎকল) বিস্তৃত করেছিলেন এবং প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির উপর নিরন্তর নজরদারি রেখেছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পশ্চিমে সিন্ধুতে নিয়ে যান। তিনি সম্ভবত তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। জাভা ও সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজা বালপুত্রদের নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচটি গ্রামের অনুদান চেয়ে তাঁর রাজ্যে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর

রাজত্বকালে নালন্দা প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও মানুষ বৌদ্ধ সাহিত্য শেখার জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বাংলায় বিদ্যাচর্চার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। বাংলার ইতিহাসে এই পর্ব একটি গৌরবময় অধ্যায়।

৯.১০ সারাংশ

দেবপালের মৃত্যুতে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ও তেজ বেশিদিন টিকতে পারেনি। তার উত্তরসূরিদের পতন এবং রাজনৈতিক অবক্ষয় একটি নিশ্চিত প্রক্রিয়া ছিল যা উত্তর ভারতে পালদের প্রায় একটি নগণ্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে।

৯.১১ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. ধর্মপালের কৃতিত্বের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. দেবপালের কৃতিত্বের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৩. পাল রাজা ধর্মপাল ও দেবপালের অধীনে ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৯.১২ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

পল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, 1989।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪০০।

একক ১০ ❑ পাল সাম্রাজ্যের পতন

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ ভূমিকা

১০.২ প্রথম বিগ্রহপাল

১০.৩ নারায়ণ পাল

১০.৪ পাল রাজ্যের ভাঙন

১০.৫ সারাংশ

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১০.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- দেবপালের পর পাল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন ব্যাখ্যা করা।
- প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের শাসনকাল আলোচনা করা।
- পাল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও চূড়ান্ত পতনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করা ও পতনের পিছনে যে কারণগুলি ছিল তা অনুধাবন করা।

১০.১ ভূমিকা

পাল সম্রাটদের দীর্ঘ শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মপাল এবং দেবপাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলাকে একটি উচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু এই গৌরব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন প্রথম বিগ্রহপাল। তাঁর রাজত্ব ছিল শান্তিপূর্ণ। এই সময়কাল কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়নি। তাঁর পুত্র নারায়ণপাল ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে সিংহাসনে

আরোহণ করেন। শান্তি এবং ধর্মের প্রতি তার অত্যধিক ভালবাসা তার সাম্রাজ্যকে একটি গুরুতর সমস্যায় ফেলেছিল। এইভাবে দেবপালের উত্তরসূরিদের শাসনকালে পালদের পতন একটি নিশ্চিত প্রক্রিয়ারূপে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়। পাল শাসকরা তাদের গৌরব হারিয়ে উত্তর ভারতে একটি নগণ্য রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

১০.২ প্রথম বিগ্রহপাল

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে। দেবপাল ও প্রথম বিগ্রহপালের মধ্যে সম্পর্কের পাশাপাশি দেবপালের উত্তরসূরির নাম নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

১০.৩ নারায়ণপাল

নারায়ণপাল প্রায় ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তার পিতার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের আক্রমণের কারণে তাঁর রাজত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাদল স্তম্ভ শিলালিপি এবং ভাগলপুর তাম্রশাসন উভয়ই নারায়ণপালের সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে নীরব। তিনি দীর্ঘ সময় (প্রায় ৫৪ বছর) শাসন করেছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোন সামরিক বিজয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারায়ণপাল ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছিলেন। সম্ভবত তিনি পুরোপুরি পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি প্রতিহারের সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকেও রক্ষা পাননি। প্রতিহার রাজা প্রথম ভোজ এবং তার পুত্র মহেন্দ্রপাল নারায়ণপালের থেকে মগধ দখল করতে সফল হন। পাহারপুর লিপিতে এই বিজয়ের উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রকূটদের সিরুর শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের শাসকরা রাষ্ট্রকূট রাজা আমাঘবর্ষকে শ্রদ্ধা জানাতেন। এই তিনটি নাম ভিন্ন রাজ্যের নাকি অভিন্ন শাসক রয়েছে তা খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবত পাল সাম্রাজ্যের আকস্মিক পতন স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের অনুমানের দিকে নিয়ে যায় যে সাম্রাজ্য একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল এবং সম্ভবত এই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংকট শুরু হয়েছিল।

রাষ্ট্রকূট রাজা আমাঘবর্ষ পূর্ব উপকূল বরাবর অগ্রসর হন। বেঙ্গী জয়ের পর রাষ্ট্রকূট সেনাবাহিনী পাল রাজ্যের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে। যদিও এটি ছিল একটি সাময়িক সামরিক অভিযান এবং এর কোনো স্থায়ী প্রভাব ছিল না কিন্তু এটি পাল শাসকদের দুর্বল অবস্থাকে প্রকাশ করে। এভাবে পালদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। পাল রাজ্যের দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী কামরূপ রাজ্যের শাসকরা এবং উড়িষ্যার শুল্কিবংশীয় মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভ রাঢ়ের কিয়দংশ অধিকার করেন।

রাষ্ট্রকূটদের বিরুদ্ধে নারায়ণপালের পরাজয় প্রতিহার রাজা প্রথম ভোজকে পাল শাসকদের কাছ থেকে

উত্তর ভারতের সাম্রাজ্য কেড়ে নিতে উৎসাহিত করেছিল। তিনি পশ্চিমে রাজনৈতিক আধিপত্যের অবশিষ্টাংশগুলি ধ্বংস করেন এবং পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। তিনি বুন্দেলখণ্ড এবং উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে বশীভূত করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে পাল শাসকদের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার ফলে মগধের প্রায় সীমানায় পৌঁছনো পর্যন্ত তাঁকে পাল রাজাদের কোনও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। কালহা অনুশাসন অনুসারে প্রতিহার রাজা প্রথম ভোজ কালচুরি রাজা প্রথম কোক্কাল্লা কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিলাম। পুরস্কার হিসাবে প্রথম ভোজ তাঁকে প্রতিহার আক্রমণের ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং স্বাধীনভাবে বঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের ধন লুণ্ঠন করতে পারে সেই সমর্থনও জানিয়ে ছিলেন। প্রথম ভোজ গুহিলাত রাজা দ্বিতীয় গুহিলার থেকেও সমর্থন পেয়েছি। সমসাময়িক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুসারে দ্বিতীয় গুহিলা গৌড় রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এইভাবে প্রথম ভোজ পাল শাসকদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জোট সংগঠিত করতে সফল হয়েছিলাম। গোরখপুরের কালচুরি রাজারা, জেজাকভুক্তি বা বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্লা শাসকরা তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে এবং পাল-বিরোধী মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধে প্রতিহার রাজার অসাধারণ সাফল্য এবং পাল শাসকদের সম্পূর্ণ পতনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। অন্যদিকে দেবপালের মতো দক্ষ পাল শাসকের অনুপস্থিতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পাল রাজাদের ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে তাদের দূরদর্শিতার অভাব ও কূটনীতির অক্ষমতার পরিচয় দেয়। এছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। দেবপাল তাঁর রাজত্বকালে আসাম ও ওড়িশাকে পরাধীন করেছিলেন। কিন্তু নবম শতাব্দীর শেষার্ধে এই দুটি প্রতিবেশী রাজ্য আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আসাম ও ওড়িশার ক্রমবর্ধমান উত্থান পাল রাজাদের দুর্বলতার কারণ হতে পারে।

নারায়ণপাল প্রায় ৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং তাঁর পুত্র রাজ্যপাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। নারায়ণপালের রাজত্বকালে পাল পরিবার এবং রাষ্ট্রকূট পরিবারের মধ্যে একটি বৈবাহিক মৈত্রী তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রকূট রাজা তুঙ্গের কন্যাকে নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। এই বৈবাহিক জোট অন্তত সাময়িকভাবে এই দুই রাজবংশের মধ্যে বৈরিতার অবসান ঘটিয়েছে। এভাবে রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি রাষ্ট্রকূট রাজার সমর্থন পান। এভাবে তিনি অন্তত ৩২ বছর কম-বেশি শান্তিপূর্ণভাবে শাসন করেন। মন্দিরের জলাশয়, রাস্তা, রাস্তার আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণের মতো জনউপযোগী কাজের জন্য তাকে সাধারণত কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তার রাজত্বের তথ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বারগাঁও শিলালিপি। রাজ্যপাল ৯৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মারা যান এবং তার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল তার স্থলাভিষিক্ত হন।

দ্বিতীয় গোপাল প্রায় ২০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তার শাসনকালে চান্দেল্লা রাজা এবং কলচুরি রাজার উত্থান ঘটেছিল এমন ভূখণ্ডে যা আগে প্রতিহার শাসকদের দখলে ছিল। কম্বোজ উপজাতিরাও বাংলার উত্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ঘটনাগুলি দ্বিতীয় গোপালকে বিহারের দক্ষিণ অংশ এবং বাংলার পশ্চিম অংশে কোণঠাসা করে দেয়। সমসাময়িক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুসারে প্রায় ৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়

বিগ্রহপাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল প্রায় ২২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে পাল সাম্রাজ্য বিহারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বাংলার পূর্ব দিক থেকে চন্দ্র রাজা কল্যাণচন্দ্র গৌড় ও কামরূপ জয় করেন। এই বিজয়গুলি ছিল মারাত্মক আঘাত যা কম্বোজ রাজ্যের পাশাপাশি পাল রাজ্যকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর প্রথম মহীপাল ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে উত্তরাধিকারী হন। তার রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের ভাগ্যের পুনরুত্থান ঘটে। দ্বিতীয় মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। কিছু পরিমাণে তিনি সফল হয়েছিলেন যদিও তাঁর শাসন সাময়িকভাবে চোল রাজা রাজেন্দ্র চোলের উত্তর-অভিযানের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। রাজেন্দ্র চোলের উত্তর-অভিযানটি তাঁর একজন চোলের সেনাপতির নেতৃত্বে ছিল এবং ১০২১ খ্রি: থেকে ১০২৩ খ্রি: পর্যন্ত প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় চোল সাম্রাজ্যের মতন শক্তিশালী সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে ছিল না। চোল সেনাবাহিনী প্রথমে উড়িশা ও দক্ষিণ কোশল দখল করে। এরপর চোল বাহিনী দণ্ডভুক্তি অধিকার করে। দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্মপাল এবং দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে চোল শক্তি পরাজিত করে এই দুটি রাজ্য নিজেদের আয়ত্বে আনে। এরপর বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র এবং পাল সম্রাট মহীপাল উভয়েই চোলদের হাতে পরাস্ত হয়। চোল বর্ণনা অনুযায়ী মহীপাল ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন এবং চোল সেনাপতি পাল বাহিনীর রণহস্তি, নারীগণ ও ধনরত্ন লুঠপাঠ করে। চোল সেনাপতি উত্তর-রাঢ়ের উপর তাঁর আধিপত্য কায়েম করে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে চোল আক্রমণের সময় দণ্ডভুক্তি দক্ষিণ রাঢ় এবং বঙ্গালদেশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য ছিল। কেবলমাত্র উত্তর-রাঢ় মহীপালের অধীন ছিল। এই কারণে চোল লিপিতে মহীপারের পরাজয় এবং উত্তর রাঢ় দখল পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার উভয়েই মনে করেন চোল বিজয়ের কোনও স্থায়ী প্রভাব বাংলায় পড়েনি। চোল বাহিনীর প্রস্থানের পরে মহীপাল দক্ষিণ রাঢ় ও দক্ষিণ বঙ্গ জয় করে সমগ্র বঙ্গে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে মহীপাল সম্ভবত মিথিলা জয় করেছিলেন। বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে প্রাপ্ত একটি লিপি (লিপিটি ১০৮৩ সংকেত বা ১০২৬ খ্রিঃ উৎকর্ণ) থেকে দেখা গেছে যে মহীপাল অনুজ শ্রীমান স্থিরপাল ও শ্রীমান বসন্তপাল মহীপালের নির্দেশে নতুন নতুন মন্দির নির্মাণ ও পুরনো মন্দিরের সংস্কার করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় ১০২৬ খ্রিঃ মহীপালের রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে খুব সম্ভবত মহীপালের সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ১০২৬ খ্রিঃ পরে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব অঙ্গদেশ জয় করেছিলেন বলে গোহরবা লিপিতে দাবি করা হয়েছে। ১০৩৪ খ্রিঃ যখন আহমদ্ নিয়ালতিগীন যখন বারাণসী আক্রমণ করেন, তখন এই শহর কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধীনে ছিল।

দ্বিতীয় মহীপাল গজনীর সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের শাহী রাজাদের দ্বারা সংগঠিত হিন্দু জোটে যোগদান না করার জন্য কিছু লেখকের দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর বৈরাগ্যকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী করেছেন, এবং অন্যরা হিন্দু ধর্মের অসহিষ্ণুতা এবং অন্য হিন্দু রাজাদের প্রতি ঈর্ষাকে

দায়ী করেছেন। এই মতামত গ্রহণ করা কঠিন, দ্বিতীয় মহীপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পাল শক্তি সর্বনিম্ন গভীরতায় তলিয়ে গিয়েছিল এবং পাল রাজাদের নিজেদের দেশে কোনও শক্তি ছিল না। পৈতৃক অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে এবং রাজেন্দ্রচোল এবং গঙ্গেয়দেবের ভয়ঙ্কর আক্রমণগুলি প্রতিরোধ করতে এটি অবশ্যই দ্বিতীয় মহীপালের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। এটি তাঁর দক্ষতা এবং সামরিক প্রতিভার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বকে প্রতিফলিত করে যে তিনি বাংলার বিশাল অংশে কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সফল হন এবং সম্ভবত বারাণসী পর্যন্ত তার বিজয়কে প্রসারিত করেছিলেন।

সামগ্রিকভাবে, দ্বিতীয় মহীপালের কৃতিত্বকে অবশ্যই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং তিনি দেবপালের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ পাল সম্রাট হিসাবে স্থান পেয়েছেন। তিনি কেবল পাল রাজ্যকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেননি, সম্ভবত কিছু পরিমাণে পুরানো সাম্রাজ্যের স্বপ্নকেও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। সীমিত ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য যা তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তা তাঁর দক্ষতা এবং রাষ্ট্রনায়কত্বের একটি নিশ্চিত পরিমাপ, এবং তিনি আরও কিছু করেননি বলে অভিযোগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয় মহীপাল বারাণসী (সারনাথ সহ) ও নালন্দার মন্দির ইত্যাদির সংস্কার করেছিলেন। পালদের পতনের কারণে এইগুলি অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল।

এটি সম্ভবত তাৎপর্য ছাড়াই নয় যে, সমস্ত পাল সম্রাটদের মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয় মহীপালের নামই বাংলায় এখনও প্রচলিত জনপ্রিয় পদগুলিতে রয়েছে। বাংলা তার সম্রাট ধর্মপাল এবং দেবপালের নাম ভুলে গেছে, কিন্তু মহীপালের স্মৃতিকে লালন করেছে যিনি বাংলাকে একটি সংকটময় মুহূর্তে রক্ষা করেছিলেন।

১০.৪ পাল রাজ্যের ভাঙন

দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্য ধীরে ধীরে ভেঙে যায়। নয়পাল দ্বিতীয় মহীপালের স্থলাভিষিক্ত হন যার রাজত্ব কলচুরি রাজা কর্ণদেবের কাছ থেকে ব্যাপক আক্রমণের সাক্ষী ছিল। নয়পালের রাজত্বের পরেও পাল রাজারা কলচুরি শাসকদের সাথে ক্রমাগত শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন। নয়পালের স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল যার তিন পুত্র ছিল তৃতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় সুরপাল এবং রামপাল। রামপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্রী অঞ্চলের কৈবর্ত নেতা দিব্য বিদ্রোহ করেন। রামপাল বিদ্রোহ দমন এবং পালদের শক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে সফল হন। কিন্তু পাল রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। রামপালের চার পুত্র ছিল। বিত্তপাল, রাজ্যপাল, কুমারপাল ও মদনপাল। রামপালের স্থলাভিষিক্ত হন কুমারপাল। কিন্তু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুসারে একটি সমান্তরাল শাসন মদনপাল কায়েম করেছিলেন। এই দুই পাল রাজা কখন এবং কীভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। কুমারপালের স্থলাভিষিক্ত হন তার শিশুপুত্র তৃতীয় গোপাল।

তিন শাসক কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালের সময়কাল পাল রাজ্যের চূড়ান্ত পতনের সাক্ষী ছিল। এই চূড়ান্ত পতনের দিকে চালিত পরিস্থিতিগুলি এখনও ঐতিহাসিকদের কাছে স্পষ্ট হয়নি।

১০.৫ সারাংশ

এইভাবে একাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাল সার্বভৌমত্বের বুনন ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিল। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ নিশ্চিতভাবেই তাঁদের হাত থেকে চলে গিয়েছিল এবং মগধের উপর তাদের আধিপত্য কেবল নামেই রয়ে গিয়েছিল। একটি নতুন শক্তি, বর্মণরা, পূর্ব বাংলা দখল করে এবং রত্নপালের একটি তাম্রশাসন দেখায় যে এমনকি কামরূপও খ্রিস্টীয় ১১ শতকের শুরুতে বা মাঝামাঝি গৌড়ের রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বন্ধ করে দেয়।

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. পাল শাসনের পতনের সময় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. কৈবর্ত বিদ্রোহের উপর একটি টীকা লিখুন।

১০.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

পল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

একক ১১ ❑ পাল যুগে স্বাধীন রাজ্য

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ ভূমিকা

১১.২ চন্দ্র শাসকগণ

১১.৩ বর্মণ শাসক

১১.৪ সারাংশ

১১.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১১.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- পাল শাসনকালে স্বাধীন রাজ্যের বিকাশ বাংলায় কীভাবে হয়েছিল তা আলোচনা করা।
- দুটি ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিহাস এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হবে :
  - ☞ চন্দ্র শাসন
  - ☞ বর্মণ শাসন

১১.১ ভূমিকা

চন্দ্র ও বর্মণ চন্দ্র ও বর্মণ রাজবংশ ছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শাসক রাজবংশ যারা পাল আধিপত্যের সময়কালে বাংলা ও বিহারে বিকাশ লাভ করেছিল। পাল শাসনকালে পাল অঞ্চলের চারপাশে এবং অভ্যন্তরে বেশ কিছু স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন শক্তির বিকাশ ঘটে। যদিও এই স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন শক্তি এবং পাল শাসকদের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্টভাবে জানা যায় না তবে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

১১.২ চন্দ্র শাসকগণ

চন্দ্র রাজবংশ ছিল বাংলার সমতট অঞ্চলের শাসক রাজবংশ। সম্ভবত চন্দ্রদের ভূখণ্ডের মধ্যে আরাকান

অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত। চন্দ্র রাজবংশের তথ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল চন্দ্র শাসকদের দেওয়া বিভিন্ন শিলালিপি এবং তাম্রঅনুশাসন যেমন লায়াহাচন্দ্রর ভারেল্লা লিপি, শ্রীচন্দ্রের রামপুর তাম্রশাসনের লিপি, শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর তাম্রশাসনের লিপি, ধুলিয়া তাম্রশাসনের লিপি এবং কেদারপুর তাম্রশাসনে ইত্যাদি। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথ তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চন্দ্র রাজবংশের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত চন্দ্র শাসকরা পাল শাসকদের তুলনায় একটু আগে শাসক রাজবংশ ছিল। তারানাথের মতে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে চন্দ্র শাসকরা শাসন করেছিলেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল। পরবর্তীকালের পরম্পরাগত বিবরণে আরাকানের নয়জন রাজার বিবরণ পাওয়া গিয়েছে, যারা ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিল। মোরাহাউং-এর শিতাং মন্দিরের প্রাপ্ত শিলালিপিটিও চন্দ্র রাজাদের শাসন সম্পর্কে তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই শিলালিপি অনুসারে আনন্দচন্দ্র এই রাজবংশের অন্যতম বিখ্যাত শাসক হলেও তিনি এই শাসনের প্রতিষ্ঠাতা নন। এই শিলালিপিতে তাঁর আঠারোজন পূর্বসূরির নাম দেওয়া আছে। এই বংশ তালিকা অনুসারে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বালাচন্দ্র। তারনাথের বিবরণে এই নামটি প্রচলিত। অধ্যাপক হিরানন্দ শাস্ত্রীর মতে প্রাচীনতম শিলালিপিটি পূর্বতন গুপ্ত লিপির অনুরূপ অক্ষরে লেখা। উপরে উল্লিখিত চন্দ্র রাজাদের নামের লিপিবদ্ধ শিলালিপিটি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরের চেয়ে 'অনেক শতাব্দী প্রাচীন' বলে জানা যায়। প্রীতি চন্দ্র নামটি মুদ্রার পাশাপাশি শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। অধ্যাপক ফায়ারের মতে বেশিরভাগ মুদ্রায় খোদাই করা নামটি হল 'বম্ম চন্দ্র'। অধিকাংশ পণ্ডিতই তাকে ধম্মচন্দ্র বলে চিহ্নিত করেছেন। মুদ্রায় অন্য যে নামটি পড়া যায় তা হল বীর চন্দ্র। এই মুদ্রার বর্ণমালা সপ্তম শতাব্দী বা অষ্টম শতাব্দীর যদি না তার আগের হয়।

যদিও চন্দ্র রাজাদের সঠিক বংশরেখা আমাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয় কিন্তু সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে লহয়চন্দ্রদেব ছিলেন এই বংশের প্রথম দিকের রাজা। ভারেল্লা শিলালিপিতে লহয়চন্দ্রদেবের কথা উল্লেখ আছে। এই শিলালিপির ভিত্তিতে ড. এন. কে. ভট্টশালী অনুমান করেন যে লহয়চন্দ্রদেবের রাজ্য অবশ্যই বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এপিগ্রাফিক রেকর্ডে বিভিন্ন রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেখান থেকে একটি বংশতালিকা তৈরি করা যেতে পারে। রাজবংশটি সম্ভবত পূর্ণচন্দ্রদেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার স্থলাভিষিক্ত হন সুবর্ণচন্দ্রদেব। সুবর্ণচন্দ্রের উত্তরসূরি ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব মহারাধিরাজের রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি অন্যান্য অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করতে সফল হতে পারেন। আরেকটি নাম শ্রীকাঞ্চন একটি শিলালিপিতে পাওয়া যায় যার পরিচয় এখনও আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। এটা খুবই সম্ভব যে তিনি ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে সমান্তরাল শাসক ছিলেন। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে শ্রীকাঞ্চন এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব একই ব্যক্তি ছিলেন। ত্রৈলোক্য চন্দ্র দেবের স্থলাভিষিক্ত হন শ্রীচন্দ্র দেব। শ্রীচন্দ্রদেবও 'মহারাজাধিরাজা' এর রাজকীয় উপাধি ব্যবহার করেছিলেন।

পূর্ণচন্দ্রদেব সম্ভবত একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। তার পূর্বপুরুষরা রোহিতগিরির শাসক বলে কথিত আছে। সম্ভবত পূর্ণচন্দ্রদেবও সেখানে রাজত্ব করতেন। পূর্ণচন্দ্রদেবের পৌত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব চন্দ্র দ্বীপের

রাজা হয়েছিলেন বলে এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। এভাবে দেখা যাবে যে পূর্ণচন্দ্র এবং তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্রদেব উভয়েই রোহিতগিরির রাজা ছিলেন। বেশিরভাগ পণ্ডিত সাধারণত বিহারের শাহাবাদ জেলার রোহিতসগড়ের সাথে রোহিতগিরিকে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু এই শনাক্তকরণ কোনোভাবেই নিশ্চিত নয়। ড. এন. কে. ভট্টশালী পরামর্শ দিয়েছেন যে রোহিতাগিরি লাল-মাটির একটি সংস্কৃত রূপ হতে পারে এবং বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লার কাছে লালমাই পাহাড়কে নির্দেশ করে। এই উপসংহারে আসার যথেষ্ট কারণ নেই যে চন্দ্র শাসকরা বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং বাঙ্গালা বা পূর্ব বাংলায় চন্দ্র রাজাদের দীর্ঘ বংশ ধারার ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেই রোহিতগিরিকে চন্দ্রদের পূর্বপুরুষের ক্ষমতার কেন্দ্র বলে মনে করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সম্ভবত বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লার কাছে এর অবস্থান ছিল।

সুবর্ণচন্দ্র এবং তাঁর পিতা উভয়েই সম্ভবত ক্ষুদ্র স্থানীয় শাসক ছিলেন কিন্তু সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব তাঁর পরিবারের যশের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ত্রৈলোক্য চন্দ্রদ্বীপ এবং হরিকেলকে তাঁর পৈতৃক আধিপত্যে যুক্ত করেছিলেন এবং মহারাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেছিলেন। তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র পরম সৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক প্রভৃতি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে মহারাজাধিরাজ উপাধিটি পেয়েছিলেন। শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আমাদের শ্রীচন্দ্রের রাজ্যের পরিধি সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা তৈরি করতে সক্ষম করে। চন্দ্রদ্বীপ এবং হরিকেল যার উপর তিনি শাসন করেছিলেন তা প্রায় সমগ্র পূর্ব বাংলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলগুলিরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

বাংলার আর একজন রাজা যার নাম চন্দ্র দিয়ে শেষ হয়েছে, তিনি হলেন গোবিন্দচন্দ্র। রাজেন্দ্র চোলের বাংলা আক্রমণের বিবরণ থেকে এই তথ্য জানা যায়। গোবিন্দচন্দ্র যে পূর্ব বাংলায়ও রাজত্ব করেছিলেন তা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরে সম্প্রতি আবিষ্কৃত তাঁর ১২ ও ২৩ তম বছরের দুটি শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয়। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে গোবিন্দচন্দ্র কার্যত শ্রীচন্দ্রের রাজ্যেই রাজত্ব করেছিলেন। যেহেতু রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ প্রায় ১০২১ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল, এটা খুব সম্ভব যে গোবিন্দচন্দ্রদেব অবিলম্বে শ্রী চন্দ্রদেবের স্থলাভিষিক্ত হন। কলচুরীর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে চন্দ্র রাজ্যকে কলচুরী রাজাদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোক্কাল্লা দাবি করেন যে তিনি বঙ্গের কোষাগারে অভিযান চালিয়েছেন এবং তার প্রপৌত্র লক্ষ্মণরাজাকে বাঙ্গালা জয়ের কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। কোক্কাল্লার বিজয়ের সময় চন্দ্র শাসকরা তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা সন্দেহ, তবে বাংলায় তাদের শাসনকে সুসংহত করার জন্য তারা এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়েছিল কিনা তা অসম্ভাব্য নয়। খুব সম্ভবত কর্ণ দেবের আক্রমণে চন্দ্র রাজ্য শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

১১.৩ বর্মণ শাসক

বর্মণ শাসকরা ১১তম এবং ১২ শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় শাসন করেছিলেন। বর্মনদের ইতিহাস তিনটি তাম্রশাসন এবং ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর শিলালিপি থেকে জানা যায়। বর্মণ রাজারা সিংহপুরের যাদব রাজবংশের বংশধর বলে দাবি করেন, যেটি চিকাকোল এবং নরসন্নপেতার মধ্যে কলিঙ্গের (উত্তর উড়িষ্যা) অধুনা সিংহপুরের সাথে চিহ্নিত হয়েছে।

কলিঙ্গের সিংহপুর রাজ্যটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং খ্রিস্টীয় ১২ শতকের শেষের দিকে বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায়। বর্মণরা সম্ভবত কলচুরীরাজ কর্ণের বঙ্গ আক্রমণের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। কর্ণ উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আক্রমণ করেছিলেন বলে মনে হয়, সম্ভবত রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনীর মতো একই পথ অনুসরণ করে। এটা খুবই সম্ভব যে বর্মণরা কর্ণের সাথে এসেছিলেন, বাংলায় থেকেছিলেন এবং একটি উপযুক্ত মুহূর্তে তাদের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য তৈরি করেছিলেন।

জাতবর্মণের সামরিক বিজয়ের বিবরণ, যেমনটি ভোজবর্মণের বেলাভা লিপিতে দেওয়া হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে তিনি তাঁর রাজবংশের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। জাতবর্মণের পিতা বজ্রবর্মণকে শুধুমাত্র একজন সাহসী যোদ্ধা, একজন কবি এবং একজন পণ্ডিত হিসেবে প্রশংসা করা হয়। কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর সাথে জাতবর্মণের বিবাহের উল্লেখ এবং দিব্য, যিনি পালদের কাছ থেকে উত্তরবঙ্গ দখল করেছিলেন, ১০৫০ থেকে ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাতবর্মণের ক্ষমতায় উত্থানের তারিখ নির্ধারণ করতে আমাদের সাহায্য করে। কর্ণের কন্যার সাথে জাতবর্মণের বিবাহ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং সম্ভবত বর্মণ পরিবারের রাজনৈতিক ভাগ্যের উত্থানের একটি বড় কারণ ছিল। বঙ্গের উপর কর্ণের আক্রমণ অবশ্যই চন্দ্র সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাতটি করেছিল এবং বর্মনরা গোবিন্দচন্দ্র বা তার উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে খুব শীঘ্রই ক্ষমতা দখল করেছিল। জাতবর্মণ অবশ্যই সময়ে সময়ে বা দিব্যর ঠিক আগে ক্ষমতা দখল করেছিল।

বেলাভ লিপিতে উল্লিখিত হিসাবে জাতবর্মণের অঙ্গ আক্রমণ, তাকে অবশ্যই পাল শাসক রামপালের সাথে একটি দ্বন্দ্বে জড়িত করেছিল। রামপালের রাজত্বকালে পালদের দুর্বল অবস্থা জাতবর্মণকে প্রলুব্ধ করেছিল পাল শক্তির উপর আক্রমণ করতে। তার অন্য দুই প্রতিপক্ষ গোবর্ধন এবং কামরূপের রাজাকে চিহ্নিত করা যায় না। তার উত্তরসূরি নির্ধারণ করাও সমস্যা। কিন্তু এটা ধারণা করা হয় যে হরিবর্মণ তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তার ভাই সমলবর্মণ অনুসরণ করেন। হরিবর্মণদেব, যার অধীনে ভুবনেশ্বর প্রশস্তির ভট্ট ভবদেব মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন, সম্ভবত তিনি বর্মণ রাজবংশের হরিবর্মণই ছিলেন। দুটি বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি, যথাক্রমে রাজত্বের ১৯তম এবং ৩৯তম বছরে অনুলিপি করা হয়েছে, হরিবর্মণের নাম বলা এবং দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে হরিবর্মণের দীর্ঘ ৪৬ বছর রাজত্ব ছিল। এটি

ভুবনেশ্বর শিলালিপির তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি দীর্ঘকাল শাসন করেছিলেন।

হরিবর্মন, উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধারে রামপালের সাফল্য দেখে, তার অঞ্চলে পাল আক্রমণ এড়াতে রামপালকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। হরিবর্মণ উড়িষ্যার দিকে তাঁর শাসন সম্প্রসারিত করেছিলেন কিনা সন্দেহ। ভুবনেশ্বর শিলালিপি এবং বজ্রযোগিনী তাম্রশাসনে হরিবর্মণের পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে তাঁর সম্পর্কে খুব কমই কিছু জানা যায়। জাতবর্মণের আরেক পুত্র সমলবর্মণ পরবর্তী রাজা ছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণদের বংশতালিকার বিবরণে তাঁর নাম বিশিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাঁর রাজত্বকালে মধ্যদেশ থেকে বাংলায় চলে এসেছিলেন বলে কথিত আছে। বর্মণ এবং শ্রীলঙ্কার রাজা প্রথম বিজয়বাহুর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল; সামলবর্মনের কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী শ্রীলঙ্কার রাজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১১.৪ সারাংশ

সামলবর্মণের পুত্র ভোজবর্মণ ছিলেন রাজবংশের শেষ পরিচিত রাজা এবং বেলাভ তাম্রশাসনটি বিক্রমপুরের অবস্থিত জয়স্কন্ধবরা থেকে তাঁর পঞ্চম রাজত্বের বছরে জারি করা হয়েছিল। বর্মণ শাসকরা বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে মনে হয়। সমলবর্মণের বজ্রযোগিনী তাম্রশাসনটি প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দির বা ভীমদেব নামক একজন বৌদ্ধ ভক্তকে প্রজ্ঞাপারমিতা পড়ার পুরস্কার হিসেবে জমি দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চারজন বর্মণ রাজা প্রায় ৬০/৭০ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। ভোজবর্মণের রাজত্বের সময় বা তার পরেই সেনরা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।

১১.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বাংলার চন্দ্র বাজবংশের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. বাংলার বর্মণ রাজবংশের কৃতিত্ব সংক্ষেপে লিখুন।

১১.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

পল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

পর্যায়-৪
সেন বংশ

একক ১২ ❑ সেন সাম্রাজ্য

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ ভূমিকা

১২.২ সেন বংশের উৎপত্তি

১২.৩ উপসংহার

১২.৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১২.৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- পাল শাসনের পতনের পর বাংলায় সেন রাজবংশের উত্থান পর্যালোচনা করা।
- সেন বংশের আদি উৎস খতিয়ে দেখা এবং এই বিষয় বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত আলোচনা করা।

১২.১ ভূমিকা

কর্ণাটের পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর সেন বংশ বাংলায় তাদের শাসন শুরু করে। সেন রাজাদের বংশতালিকা অনুসারে তারা মূলত দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা।

১২.২ সেন বংশের উৎপত্তি

উমাপতি ধারর লেখা বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপি অনুসারে সেন বংশের প্রাচীনতম ব্যক্তিত্ব হলেন বীরসেন। সেন রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের অধিবাসী ছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে প্রাচীন কর্ণাট দেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিল বম্বে প্রদেশ (অধুনা মহারাষ্ট্র) হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণ অংশ ও মহীশূর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম ভাগ। সেন রাজাগণের শিলালিপি

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof \ (Dt. 18.03.2025)

অনুসারে তাঁরা চন্দ্রবংশীয় ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। পক্ষান্তরে, প্রাচীন বাংলার কুলজী গ্রন্থগুলিতে সেনদের বৈদ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উমাপতি ধার তাদের উল্লেখ করেছেন 'দক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র'। অধ্যাপক এন.জি. মজুমদার এই বাক্যাংশটিকে দাক্ষিণাত্যের রাজা হিসেবে অনুবাদ করেছেন। মাধইনগর তাম্রশাসনের শিলালিপি অনুসারে বীরসেন পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি ছিলেন না যদিও তিনি ছিলেন সেন বংশের প্রথম বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাধইনগর তাম্রফলকের শিলালিপিতে সামন্তসেনকে সেন বংশের প্রাচীনতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, 'কর্ণাট ক্ষত্রিয়দের যিনি প্রধান পুষ্পমালা, সেই সামন্ত সেন, বীরসেনের জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে বংশের কথা উজ্জ্বলভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুরাণ সাহিত্যে।' দেওপাড়া শিলালিপিতে স্পষ্টভাবে সেন শাসকদের কর্ণাট উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সামন্তসেন কর্ণাটের সম্পদে বাধা সৃষ্টিকারী শত্রুদের বধ করেছিল। অধ্যাপক ডি.সি. গাঙ্গুলীর মতে এটা ইঙ্গিত করে না যে সামন্তসেন এবং কর্ণাট দেশের 'লক্ষ্মী' (ধনের দেবী) ধ্বংসকারীর মধ্যে লড়াই কর্ণাট দেশে হয়েছিল। এর সহজ অর্থ হল সামন্তসেন একজন রাজা বা লুণ্ঠনকারীকে পরাজিত করেছিল যিনি ইতিমধ্যে কর্ণাট দেশ লুণ্ঠন করেছিলেন। পরে তিনি এই যুক্তি দেন যে সম্ভবত রাজেন্দ্রচোল যিনি ইতিমধ্যেই কর্ণাট রাজাকে পরাজিত করেছিলেন তাকে উত্তর রাঢ়ের কোথাও সামন্তসেন দ্বারা বিতাড়িত করা হয়েছিল যেখানে সেন বংশ রাজত্ব করত। কিন্তু ডক্টর ডি.সি. গাঙ্গুলী দেওপাড়া শিলালিপির লেখক কবি উমাপতি ধারার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটিকে উপেক্ষা করেছেন যে, সামন্তসেন শত্রু সৈন্যদের এমনভাবে হত্যা করেছিল যে এই অশুভ শক্তি দক্ষিণাঞ্চল ছেড়ে যাননি। এই বিবৃতিটি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে যে শত্রু সৈন্যদের মৃতদেহ দক্ষিণে পড়েছিল এবং তাই যুদ্ধও সেই অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত শিলালিপিতে উমাপতি ধারার অন্য বক্তব্য থেকেও একই অনুমান করা যেতে পারে যে রামেশ্বরমের সেতুবন্ধ অঞ্চলের কাছে সামন্তসেনের সম্মানে যুদ্ধের পদ গাওয়া হয়েছিল। এই ধরনের উল্লেখ সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি একটি অঞ্চল নির্দেশ করে। অধ্যাপক জি.এম. সরকার ড. ডি.সি. গাঙ্গুলীর মতের বিপরীত মত পোষণ করেন। অধ্যাপক জি. এম. সরকার উল্লেখ করেছেন যে 'সামন্তসেনের তৎপরতা শুধুমাত্র দক্ষিণাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল'। আরও তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সামন্তসেন কোনোভাবেই বাংলার কোনো অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

সুতরাং সেন শাসকদের উৎপত্তি বা জন্মভূমি কর্ণাট অঞ্চলে ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান মহীশূর অঞ্চলের সাথে অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' শব্দটি সম্ভবত ইঙ্গিত করে যে সেন শাসকরা মূলত জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শাসক হিসাবে কাজ করেছিল যা ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্ধারিত পেশা। কিন্তু সেন শাসকরা কীভাবে তাদের জন্মভূমি থেকে দেশান্তরিত হয়ে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল তা আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। দেওপাড়া শিলালিপি অনুসারে সামন্তসেন তাঁর শেষ দিনগুলি গঙ্গার তীরে অবস্থিত পবিত্র আশ্রমে কাটিয়েছিলেন। যেহেতু সামন্তসেনের বংশধরেরা বাংলায় শাসন করেছিল, তাই এই সিদ্ধান্তে আসা খুবই স্বাভাবিক যে, কর্ণাট বংশোদ্ভূত সেন পরিবারের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি দক্ষিণ থেকে এসে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু নৈহাটি তাম্রশাসনের শিলালিপিতে একটি বিপরীত মত পাওয়া যায় যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সেন পরিবার সামন্তসেনের জন্মের আগেই বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই বৈপরীত্য ঐতিহাসিকদের বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ডক্টর আর. সি. মজুমদার এই অস্পষ্টতা দূর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং অনুমান করেন যে সম্ভবত কর্ণাট অঞ্চলের সেন পরিবার বাংলার পশ্চিম অংশে বসতি স্থাপন করেছিল কিন্তু নিজেদের মাতৃভূমির সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। তাঁর মতে এর একজন সদস্য, সামন্তসেন, কর্ণাট অঞ্চলে তাঁর প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করেছিল এবং ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর স্বতন্ত্র দক্ষতাও দেখিয়েছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বাংলায় পারিবারিক বসতিতে ফিরে আসেন। স্পষ্টতই তাঁর বংশটিকে এত শক্তিশালী করে তুলেছিল যে তার পুত্র বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল। হেমন্তসেন ছিলেন সামন্তসেনের পুত্র এবং সেন পরিবারের প্রথম সদস্য ছিলেন যার জন্য পারিবারিক সাক্ষ্যে রাজকীয় উপাধি দেওয়া আছে। এটা সত্য যে সামন্তসেনের পূর্বসূরিদের রাজপুত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে শাসন করেছিলেন, তবে এই অস্পষ্ট সাধারণ বাক্যাংশগুলির বাইরে এমন কিছু নেই যে তারা সত্যিই স্বাধীন রাজার পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

যদিও এটি বিশ্বাস করা হয় যে 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' শব্দটি সেই সমস্ত লোকদের বোঝায় যারা যুদ্ধের জন্য তাদের পুরোহিতের মর্যাদা পরিবর্তন করেছিল তবে কিছু পণ্ডিত এই শব্দটির আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দেওপাড়া শিলালিপিতে সামন্তসেনকে 'ব্রহ্মবাদি' বলা হয়। মাধইনগর তাম্রফলকের শিলালিপিতে সেই ঘটনাগুলির উল্লেখ রয়েছে যেখানে সেন রাজপুত্ররা তিন জগত জয়ের উপযোগী বলিদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং এর ফলে যে সকল পুরোহিত সোম বলিদানযজ্ঞ করত তাদের প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। অধ্যাপক এন.জি. মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে এখানে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সামন্তসেন ততটাই ব্রাহ্মণ ছিলেন যতটা ক্ষত্রিয় ছিলেন। উইন্টারনিটজ কণকসেন নামে একজন জৈন গুরুর কথা উল্লেখ করেছেন যিনি যশধারাচরিত লিখেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে জৈন গুরুদের এই বংশ ধারাটি সেন পরিবারের অন্তর্গত কারণ এই গুরুদের সকলের নাম—সেন-এ শেষ হয়। তাঁরা কর্ণাট অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র ধারওয়ার জেলায় বসতি স্থাপন করেছিল। জৈন সাক্ষ্য অনুসারে এই পরিবারের প্রায় ১১ জন সদস্যের বিকাশ ঘটেছিল ৮৫০ খ্রি: থেকে ১০৫০ খ্রি:-এর মধ্যে। জৈন সাক্ষ্যে একজন বীরসেনের কথা উল্লেখ আছে, একটি নাম যা দেওপাড়া শিলালিপিতে সেন রাজাদের পূর্বপুরুষ হিসেবেও লিপিবদ্ধ আছে। প্রমাণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে বাংলার সেন শাসকরা কোনো না কোনোভাবে জৈন গুরুদের এই কর্ণাট পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই তত্ত্বের সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ পরিবারটি বাংলায় অভিবাসনের আগে বা পরে ক্ষত্রিয় পেশা গ্রহণ করেছিল কিনা এই প্রশ্নটি থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল সেন শাসকদের পরিবার কীভাবে বাংলায় বসতি স্থাপন করছিল। যেহেতু এই প্রশ্নের কোন সঠিক তথ্য নেই তাই এর কোন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। পাল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছে যে তারা বিদেশিদের নিয়োগ করত যারা শিলালিপিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো

যথেষ্ট ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে কর্ণাটের কিছু আধিকারিক ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়লে স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এই অনুমানটি নৈহাটি তাম্রশাসনের শিলালিপির দ্বারা সমর্থিত যে সেন শাসকরা রাঢ় অঞ্চলে সামন্তসেনের অনেক আগে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

সেন শাসকরাও হয়তো কিছু বিদেশি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এসে বিজিত অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কর্ণাট রাজপুত্র বিক্রমাদিত্য বাংলার বিরুদ্ধে একটি বিজয়ী অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে অন্যরা অনুসরণ করে। সামন্তপ্রধান আচকে 'কলিঙ্গ, বঙ্গ, মারু, গুর্জর, মালব, চেরা এবং চোল'-এর রাজাদের বিক্রমাদিত্যের সার্বভৌম অধীনস্থ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যথাক্রমে ১১২১ খ্রি: এবং ১১২৪ খ্রি: দুটি শিলালিপিতে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড়, মগধ এবং নেপাল জয়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে প্রায় একই সময়ে যখন সেন শাসকরা বাংলায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছিল তখন আরেক কর্ণাট প্রধান নান্যদেব বিহার ও নেপালে একই কাজ করছিলেন।

১২.৩ সারাংশ

অন্যদিকে এটি অনুমান করা হয়েছে যে বাংলা ও বিহারের কর্ণাট প্রধানরা হয় রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনীর বা কলচুরি রাজবংশের রাজা কর্ণদেবের কর্ণাট মিত্রদের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু এই অনুমান কতদূর সত্য বলা কঠিন। কর্ণাটের সেনরা চোলদের শাসক রূপে মেনে নেবে এটা হয়ত খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। কর্ণাটদের সাথে কর্ণদেবের জোট একটি অস্থায়ী চরিত্রের ছিল। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে চালুক্য রাজপুত্র বিক্রমাদিত্যের বাংলায় আক্রমণের সময় কিছু কিছু কর্ণাট দেশীয় পরিবার এই প্রদেশে থেকে যায়। সেন ও বর্মণ রাজবংশ এই ধরনের পরিবার।

১২.৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বাংলার সেন রাজবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. এটা কি বলা ঠিক হবে যে সেনরা বাংলার বাইরে থেকে এসেছিল?

১২.৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

পল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

একক ১৩ ❑ সেন রাজা—সামন্তসেন থেকে লক্ষ্মণসেন

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ ভূমিকা

১৩.২ সেন বংশের সূচনা—সামন্তসেন এবং হেমন্তসেন

১৩.৩ বিজয়সেনের রাজত্ব

১৩.৪ বল্লালসেন

১৩.৫ লক্ষ্মণসেন

১৩.৬ সারাংশ

১৩.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৩.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা, বিকাশ, সম্প্রসারণ, সংহতকরণ এবং অবক্ষয় ও পতন ব্যাখ্যা করা।
- নিম্নলিখিত সেন বংশীয় শাসকদের কথা এই এককে আলোচিত হবে :
  - সামন্তসেন
  - হেমন্তসেন
  - বিজয়সেন
  - বল্লালসেন
  - লক্ষ্মণসেন

১৩.১ ভূমিকা

পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলা আবারও সঙ্কটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাক্ষী হয়। একাদশ শতকের শেষের দিকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, যখন বিজয়সেন পাল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof \ (Dt. 18.03.2025)

বাংলার ক্ষমতা দখল করে। এভাবে বাংলায় নতুন সাম্রাজ্যের যাত্রা শুরু হয়। এই রাজবংশ বাংলার সেন রাজবংশ নামে পরিচিত। সেন শাসকরা বাংলায় সাফল্য পেলেও তারা বাংলার লোক ছিলেননা। তাঁরা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে এসেছে। এই অভিবাসনের কারণ এবং প্রক্রিয়া এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, সেনরাও হয়তো কিছু বিদেশি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এসেছিলেন এবং বিজিত অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিক একইভাবে যেমন হোলকার এবং সিন্ধিয়ার মতো মারাঠা প্রধানরা উত্তর ভারতে অষ্টাদশ শতকে করেছিলেন।

১৩.২ সেন বংশের সূচনা—সামন্তসেন এবং হেমন্তসেন

সেন রাজবংশের প্রাথমিক ইতিহাস পরিষ্কার নয় এবং তাই অনেক বিতর্কিত। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে সেনদের পূর্বপুরুষ হিসেবে সামন্তসেন এবং হেমন্তসেনের নাম উল্লেখ আছে। বেশির ভাগ গবেষক অনুমান করেন যে সেন পরিবারের কর্ণাট অঞ্চল থেকে গাঙ্গেয় বাংলায় এসেছিল সামন্তসেনের সময়ে। কিন্তু নৈহাটি তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সামন্তসেনের জন্ম সেই পরিবারে, যে পরিবার রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করত। এ থেকে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায় যে সামন্তসেনের জন্মের আগে সেন পরিবার বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই দ্বন্দ্বগুলো মীমাংসা করার চেষ্টা করেছিলেন এই ধারণা করে যে, যদিও সেন পরিবার দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলায় এসেছিল এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল কিন্তু মাতৃভূমির সাথে তাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। সেন শাসকদের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে এই বিতর্ক এবং বিভ্রান্তি সত্ত্বেও এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে শাসক হিসাবে সেন পরিবারের উৎপত্তি সামন্তসেন থেকে শুরু হয়েছিল যদিও তিনি কখনও কোনও রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেননি এবং আমাদের হাতে এমন কোনও প্রমাণ নেই যা প্রমাণ করতে পারে যে তিনি বাংলায় একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামন্তসেনের পুত্র ছিলেন হেমন্তসেন। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের শেষের দিকে হেমন্তসেন একটি স্বাধীন রাজ্য রাঢ় অঞ্চলে স্থাপন করেন। সম্ভবত পাল রাজ্যের সংকট তাঁকে তাঁর স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম করেছিল। তাঁর রাজত্ব সংক্রান্ত কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রফলকে হেমন্তসেনকে মহারাজাধিরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে হেমন্তসেনের মহারাণী বা প্রধান রাণী হিসেবে যশোদেবীর নাম উল্লেখ আছে। যদিও এই দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে হেমন্তসেনকে স্বাধীন শাসক হিসেবে নির্দেশ করে কিন্তু তাঁর রাজত্বের অবস্থা সম্পর্কে এখনও কোনো তথ্য দেয় না।

১৩.৩ বিজয়সেনের রাজত্ব

সেন রাজবংশের প্রথম সবচেয়ে বিশিষ্ট শাসক ছিলেন নিঃসন্দেহে বিজয়সেন। তিনি তাঁর পিতা হেমন্তসেনের সিংহাসনে বসেন। এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে তিনি ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে

দীর্ঘ রাজত্ব উপভোগ করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন, সমস্ত বাংলা এবং উত্তর বিহারের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এত দীর্ঘ শাসনকাল থাকা সত্ত্বেও এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে তাঁর রাজত্বের কথা উল্লেখ করে তথ্যের উৎস হিসেবে আমাদের কাছে মাত্র দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য রয়েছে। এই দুটি সাক্ষ্য হল ব্যারাকপুর তাম্রশাসন এবং দেওপাড়া শিলালিপি। বেশির ভাগ পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে বিজয়সেন তার রাজনৈতিক জীবন একজন সামন্ত প্রভু হিসাবে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি প্রায় সমগ্র বাংলা জয় করে সেন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তিনি রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন সামন্ত প্রধানদের পরাজিত করেন এবং বর্মণ শাসকদের কাছ থেকে বাংলার পূর্বাঞ্চলও জয় করেন। তিনি পাল শাসকদের কাছ থেকে উত্তরবঙ্গের কিছু অংশও জয় করেন। কিন্তু তিনি কোন পরিস্থিতিতে এসব সাফল্য পেয়েছেন তা এখনো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শাসনের প্রথম পঁচিশ বছরের তথ্য আমাদের হাতে নেই। অনুমান করা হয় যে তিনি ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরগুলিতে সমসাময়িক রাজনীতিতে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। সম্ভবত তিনি কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় পাল শাসক রামপালের মিত্র ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত সহযোগী সামন্ত প্রধানদের একজন হিসেবে নিদ্রাবলির জনৈক বিজয়রাজের নাম উল্লেখ করেছে। সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে রামচরিতের বিজয়রাজা বিজয়সেন ছাড়া আর কেউ নন। তাই বলা যেতে পারে যে তিনি রামপালের সমসাময়িক ছিলেন এবং দক্ষিণ রাঢ়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন যখন রামপাল ভীমের বিরুদ্ধে তার অভিযানে সাফল্য পেতে অর্থ ও জমির বিনিময়ে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্বাধীন প্রধানদের সাহায্য ক্রয় করেছিলেন। এটিও প্রমাণ করে যে দক্ষিণ রাঢ় একাদশ শতকে সেন পরিবারের দখলে ছিল।

দেওপাড়া শিলালিপি অনুসারে তিনি বিলাসদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি শূর পরিবারের একজন রাজকন্যা ছিলেন যারা রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের প্রধান শাসক প্রধান ছিলেন। এই বৈবাহিক মিলনের ফলে রাঢ় তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনে চলে আসে। শূর পরিবারের সাথে বৈবাহিক মৈত্রীও তাঁকে রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করতে সাহায্য করে। সম্ভবত তিনি বঙ্গের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় আচের নেতৃত্বে কর্ণাটদের আক্রমণে সাহায্য করেছিলেন। এটি সাধারণ ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে, তবে এই ধারণাটি প্রামাণ্য তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গার সাথে একটি জোট সাধন করেন এবং রাঢ়-এ তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এর দ্বারা লাভবান হন। আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিত তাকে 'চোড়গঙ্গা-সখা' বলে উল্লেখ করেছে যার অর্থ চোড়গঙ্গাদের বন্ধু।

দেওপাড়া শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে তাঁকে বিভিন্ন স্বাধীন প্রধান যেমন নান্য, বীর, রাঘব, বর্ধন এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কৌশাম্বির শাসক দ্বোরপবর্ধন ও এই বর্ধন এবং কোটাটকীর নরপতি বীরগুণ ও বীর অভিন্ন ব্যক্তি ছিল, যারা রামপালের শিবির ভুক্ত ছিলেন।

তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নান্য এবং গৌড়ের অধিপতি। নান্য নিঃসন্দেহে কর্ণাট প্রধান যিনি আনুমানিক ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে মিথিলা জয় করেছিলেন। ভরতের নাট্যসূত্র অনুসারে, নান্য বঙ্গ ও গৌড়ের শক্তি ভঙ্গ করেছিলেন। তাই এটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, উত্তর বিহারে তার আধিপত্য সুসংহত করার পর নান্যদেব বাংলার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন যেটি তখন একটি অবক্ষয়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি প্রথমে গৌড়ের পাল রাজা এবং বঙ্গের সেন রাজা বিজয়সেনের বিরুদ্ধে আংশিক সাফল্য অর্জন করতে পারেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন এবং মিথিলায় তাঁর নিজস্ব আধিপত্য তৈরি করেন।

পাল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে উত্তরবঙ্গে মদনপালের কর্তৃত্ব তাঁর রাজত্বের অষ্টম বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যা ১১৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে পড়ে। খুব সম্ভবত বিজয়সেন উত্তর ও উত্তর পশ্চিমবঙ্গে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পালদের উৎখাত করে ১১৫২-৫৩ খ্রি:-এ। দেওপাড়া শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ আছে যে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের প্রায় ৭ মাইল পশ্চিমে দেওপাড়ায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের অপূর্ব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে এই মন্দির নির্মাণ থেকে প্রমাণিত হয় যে বরেন্দ্রর অন্তত এক অংশে বিজয়সেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কামরূপ ও কলিঙ্গের উপর বিজয়সেনের আধিপত্য কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বিজয়সেনের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যথায় তাঁর পক্ষে কলিঙ্গ ও কামরূপ আক্রমণ সম্ভব ছিল না। এখানে মনে রাখতে হবে যে মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বছরের পর বাংলায় এখনও কোনো পাল সাক্ষ্য আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এটা ভাবলে ভুল হবে না যে বিজয়সেন পাল শাসককে বাংলার সিংহাসন থেকে উৎখাত করেছিল। দেওপাড়া শিলালিপিতে এটাও লিপিবদ্ধ আছে যে বিজয়সেনের নৌবহর গঙ্গার গতিপথ ধরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল। মনে হয় গাহড়বাল, যারা এই সময়ের মধ্যে বিহারের কিছু অংশ দখল করেছিল, তারাই ছিল তার লক্ষ্যবস্তু। তবে তাঁর নৌ-অভিযান সফল হয়েছে কি না তা শিলালিপি থেকে স্পষ্ট নয়। বিজয়সেন বঙ্গেও (দক্ষিণ পূর্ব বাংলা) তার আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর ব্যারাকপুর তাম্রশাসনটি বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত বিক্রমপুরা থেকে জারি করা হয়েছিল যা বর্মন শাসকদের রাজধানী ছিল যারা একাদশ শতকের শেষ থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অঞ্চলে শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়।

তাই সম্ভবত দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি বিজয়সেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে বর্মণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এইভাবে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি বিজয়সেন বর্মণদের এবং পালদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং সমগ্র বাংলায় নিজের রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠায় সফল হন। তিনি অন্যান্য শত্রুদের পরাজিত করে বাংলায় তার সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেছেন বলে মনে হয়। তিনি পরমহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাধিরাজের রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্করের গর্বিত উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নীহাররঞ্জন রায় উভয়েই এই বিষয়ে একমত যে বিজয়সেন দীর্ঘ নৈরাজ্যের পর বাংলায় শান্তি স্থাপন করেছিলেন। পাল শক্তির অবক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে সমগ্র বাংলায় স্থানীয় স্তরের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থ ও রাজ্যের লোভ দেখিয়ে রামপাল এই সকল সামন্ত প্রভুগণকে কিছুদিনের জন্য নিজের পক্ষে এনেছিলেন। কিন্তু এদের দমন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিজয়সেন এই কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রবল প্রতাপে বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল বলে রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন। একজন সাধারণ সামন্তপ্রভু থেকে বিজয়সেন বাংলার সার্বভৌম নরপতিতে পরিণত হন। এই কৃতিত্ব কম ছিল না। রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই মত নীহাররঞ্জন রায় স্বীকার করেননি। বিজয়সেন বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই মত নীহাররঞ্জন রায় অস্বীকার করেননি, কিন্তু এর ফলে বাংলায় নবযুগ এল এই কথাটা তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। বিজয় সেনের কবিরা তাঁর স্তুতি করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ বাঙালির হৃদয়ে বিজয়সেন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এমন ইঙ্গিত ইতিহাসে নেই। পাল রাজারা যতটা বাঙালি ছিলেন, সেন রাজারা ততটা বাঙালি হতে পেরেছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের সংশয় রয়েছে। সেন রাজাদের কীর্তি কথিত হয়েছে তাদের সভাকবিদের মাধ্যমে, সেনদের স্মৃতি যেটুকু টিঁকে আছে তা রয়েছে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজের উচ্চবর্গের/উচ্চবর্ণের শ্রেণিগুলির মধ্যে। বাংলার লোকবৃত্তে ও লোক-সংস্কৃতিতে পালদের স্থান রয়েছে, সেনদের নেই।

১৩.৪ বল্লালসেন

প্রায় ৬০ বছরের দীর্ঘ রাজত্বের পর বিজয়সেন ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মারা যান এবং তাঁর পুত্র বল্লালসেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ পর্যন্ত বল্লালসেনের সময়ের দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি নৈহাটি তাম্রশাসন এবং দ্বিতীয়টি সানোখার চিত্র শিলালিপি। এইগুলিতে কোনো উল্লেখ নেই। বল্লালসেনের সামরিক বিজয়ের কথা অদ্ভুতসাগরে বলা হয়েছে যে তিনি গৌড় রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন যিনি পাল রাজবংশের গোবিন্দপালের সাথে অভিন্ন। এই তথ্যটি আনন্দভট্টের বল্লালচরিত দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যা ১৫০০ শকাব্দে রচিত হয়েছিল। সম্ভবত বল্লালসেন মগধে পালদের চূড়ান্ত আঘাত করেছিলেন। অদ্ভুতসাগরে বলা হয়েছে যে তাঁর পিতার জীবদ্দশায় বল্লালসেন মিথিলা জয় করেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে বল্লালাসেন মিথিলায় বিজয় অভিযানে তাঁর পিতা বিজয়সেনের সাথে বিজয় অভিযানে ছিলেন। যাইহোক, সেন সাম্রাজ্যের সাথে মিথিলার সংযুক্তি সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যায় না এবং নান্যদেবের উত্তরসূরিরা, যাদের বিরুদ্ধে বিজয়সেন যুদ্ধ করেছিল, তারা দীর্ঘকাল মিথিলা শাসন করেছিল। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বল্লালসেন সমাজ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কুলীনবাদের প্রবর্তন করেছিল। কুলীনবাদের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তি কুলগ্রন্থ বা কুলজিশাস্ত্র নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি। প্রকৃতপক্ষে বল্লালসেনের রাজত্বের পাঁচ বা ছয় শতাব্দী পরে রচিত এই গ্রন্থগুলিতে 'প্রচুর অসঙ্গতি এবং অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী ধারণা রয়েছে'। তাই এই গ্রন্থগুলিতে যে তথ্য রয়েছে, সেগুলিকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। তদুপরি সেন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে কোনটিই কুলীনবাদের উল্লেখ করে না। এটা জানা যায় যে ১৮ এবং ১৯ শতকে বাঙালি ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীনবাদ ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী ধারণা। তাই অনেক

পণ্ডিতদের মতে এটা খুবই সম্ভব যে কুলীনবাদের প্রবক্তারা এটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তাই হিন্দু রাজা বল্লালসেনের সময় থেকে এর উৎপত্তি বলে দাবি করেছেন।

সেনদের পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং ঐতিহ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে বল্লালসেন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তিনি ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে দানসাগর রচনা করেন। ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে অদ্ভুতসাগর লেখা শুরু করেন, কিন্তু শেষ করতে পারেনি। পিতার মতো তিনিও শিবের উপাসক ছিলেন। তিনি অন্যান্য রাজকীয় উপাধি সহ অরিরাজ-নিঃশঙ্ক-শঙ্কর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীকে বিয়ে করেন। এই বিবাহ তাদের পূর্বপুরুষের জন্মভূমির সাথে সেনদের যোগাযোগকে নির্দেশ করে।

বল্লালসেন ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেন শাসক যিনি প্রায় ১৮ বছর শাসন করেছিলেন এবং রাজ্যকে সংহত করেছিলেন। বাংলার একটি ঐতিহ্য অনুসারে, বল্লালসেনের রাজ্য ছিল পাঁচটি প্রদেশ, যেমন—বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগড়ী এবং মিথিলা নিয়ে। প্রথম তিনটি প্রদেশ বাংলাকে যথাযথভাবে নিয়ে গঠিত, যেখানে শেষটি উত্তর বিহারের সাথে মিলে যায়। বাগড়ী প্রদেশটিকে সাধারণত পণ্ডিতরা সুন্দরবন সহ বাংলার বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি অংশ রূপে চিহ্নিত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এটি আইন-ই-আকবরিতে উল্লিখিত উত্তর মেদিনীপুরের বাগড়ির মহলের সাথে চিহ্নিত করা উচিত এবং রেনেলের মানচিত্রেও দেখানো হয়েছে। এই অঞ্চল ছিল রাঢ় ও উৎকলের সীমানা।

অদ্ভুতসাগর থেকে জানা যায় যে, বৃদ্ধ বয়সে বল্লাল সেন তার পুত্র লক্ষ্মণসেনের কাছে শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং স্ত্রীসহ ত্রিবেণীর কাছে একটি এলাকায় গঙ্গার তীরে অবসর গ্রহণে তাঁর শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন।

১৩.৫ লক্ষ্মণসেন

সেন রাজবংশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন লক্ষ্মণসেন। তিনি তার পিতা বল্লালসেনের উত্তরসূরি হন এবং ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল বেশ। বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি উজ্জ্বলভাবে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি ক্ষমতায় আসার আগে গৌড় ও বারাণসী বা কাশীর রাজাকে পরাজিত করেছিলেন এবং কামরূপ ও কলিঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এটা খুবই সম্ভব যে লক্ষ্মণসেন তার যৌবনে এবং সম্ভবত তাঁর পিতামহ বিজয়সেনের রাজত্বকালে উপরোক্ত বিজয়গুলি সম্পন্ন করেছিলেন, যিনি গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপের রাজাদের বিরুদ্ধে এবং সম্ভবত কাশীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের লিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে সেনদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজা যিনি গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন। এই উপাধিটি অবশ্য বিজয়সেন এবং বল্লালসেন উভয়ের তাম্রশাসনে বা পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে অনুপস্থিত। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে লক্ষণসেন সমগ্র গৌড় জয়

করেছিলেন এবং নিজের জন্য গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই যুক্তি খুবই দুর্বল কারণ বিজয়সেনের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলায় সেন শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেন সাক্ষ্যগুলি মধ্যবর্তী সময়ের এমন কোনও ঘটনার উল্লেখ করে না যা লক্ষ্মণসেনের দ্বারা গৌড় পুনঃ বিজয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। তদুপরি বিজয়সেন ও বল্লালসেনের শাসনকালে সেনদের উত্তরবঙ্গ দখল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

লক্ষ্মণসেনের পুত্রদের তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ আছে যে লক্ষ্মণসেন পুরী, বারাণসী এবং প্রয়াগে তাঁর বিজয়ের ইঙ্গিত দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। তবে লক্ষ্মণসেনের পুত্রদের এই উচ্চপ্রশংসিত সাক্ষ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব কঠিন যে এই স্মৃতিস্তম্ভগুলি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সেনদের ক্ষমতার বিস্তারকে নির্দেশ করে। তাঁর দরবারের কবি উমাপতিধর এবং শরণ একজন বেনামী রাজার অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন যিনি প্রাগজ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী ও মগধ এবং চেদী ও ম্লেচ্ছরাজ জয় করেছিলেন। সম্ভবত চেদী এবং ম্লেচ্ছ ছাড়া এই সকলের জন্য এই প্রশংসা লক্ষ্মণসেনের জন্য দাবি করা যেতে পারে। অকালতারার শিলালিপি থেকে এটা স্পষ্ট যে রতনপুরের কলচুরিরাজগণের সামন্ত বল্লভরাজ, গৌড় রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। অন্যদিকে লক্ষ্মণসেন তার বিরুদ্ধে জয় দাবি করেছেন। দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব কমবেশি নিশ্চিত হলেও যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছিল বলা কঠিন।

লক্ষ্মণসেন যে মোটামুটি বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে এসেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর শাসনকাল উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কবিতা লিখেছেন, যার মধ্যে কিছু সংস্কৃত সদুক্তিকর্ণামৃতে সংরক্ষিত আছে এবং তাঁর পিতার শুরু করা অদ্ভুতসাগর সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর দরবারে গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবের মতো বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কবির সমাবেশ ছিল; শরণ, ধোই (পবনদূতের রচয়িতা) এবং সম্ভবত গোবর্ধনও। ভাতু দাসের পুত্র তাঁর বন্ধু শ্রীধর দাস তাঁর রাজত্বকালে সংস্কৃত শ্লোকের সংকলন সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলন করেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারক ছিলেন হলায়ুধ মিশ্র, যিনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব রচনা করেছিলেন। দেওপাড়া শিলালিপির রচয়িতা উমাপতিধর একজন মন্ত্রী এবং লক্ষ্মণসেনের একাধিক দরবারি কবিদের একজন ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়।

এটা জানা যায় যে লক্ষ্মণসেন ছিলেন একজন কট্টর বৈষ্ণব, যখন তাঁর পিতা ও পিতামহ ভক্ত শৈব ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি পরমবৈষ্ণব উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস পরিবর্তনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি। লক্ষ্মণসেন তাঁর ব্যতিক্রমী গুণাবলী এবং প্রবাদপ্রতিম উদারতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদারতা এমনকি *তবকাৎ-ই নাসিরী*-র লেখক মিনহাজ-উস-সিরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যিনি তাঁকে একজন মহান রাজা এবং "হিন্দুস্থানের রায়গণের পুরুষাণুক্রমিক খলিফা স্থানীয়" বলে বর্ণনা করেছেন এবং সুলতান কুতুব উদ্দিনের সাথে তাকে তুলনা করেছিলেন। তবে, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষের দিকে যেন প্রশাসনিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে তাঁর রাজ্যের মধ্যে বিপর্যয় ও ভাঙনের লক্ষণ দেখা দেয়। সমসাময়িক পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগুলিতে সেন রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকটি স্বাধীন প্রধানের উত্থানের কথা উল্লেখ করে, যা এর পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

যাইহোক, সেন রাজ্যে চূড়ান্ত আঘাত আসে তুর্কি আক্রমণকারী মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির কাছ থেকে। প্রকৃতপক্ষে যখন সমগ্র উত্তর ভারতে ধীরে ধীরে মুসলিম কর্তৃত্বে চলে আসে তখন তাঁরা পূর্ব দিকে অগ্রসরের চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক।

বখতিয়ার খলজি প্রথমে বিহার আক্রমণ করেন এবং তারপর ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া আক্রমণ করেন এবং লক্ষ্মণসেনকে পূর্ব বাংলায় পালাতে বাধ্য করেন। তুর্কি হানাদার বাহিনী ধীরে ধীরে পশ্চিম ও উত্তর বাংলা দখল করে বাংলায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। সেই সময় লক্ষ্মণসেন ছিলেন অশীতিপর। সুতরাং এটা সম্ভবত যে পুরানো রাজা আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর প্রতিরোধ করতে পারেননি। বখতিয়ার সুপ্রশিক্ষিত ঘোড়সওয়ারবাহিনী দল নিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে ঘোড়ার ব্যবসায়ী হিসাবে নদীয়ায় প্রবেশ করেন। বখতিয়ার যখন নদীয়া দখল করেন, লক্ষ্মণসেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পালাতে বাধ্য হন। যেখানে তাঁর বংশধররা কিছু সময়ের জন্য সেনদের শাসন অব্যাহত রাখেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তাঁর উপস্থিতি প্রমাণিত হয় বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা থেকে খুব দূরে নয় এমন একটি এলাকায় জমি দেওয়ার জন্য তাঁর ২৭তম বছরে জারি করা ভাওয়াল তাম্রশাসন অনুদান দ্বারা। তিনি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

১৩.৬ সারাংশ

লক্ষ্মণসেন তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন সামরিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে; জীবনের শেষপ্রান্তে তাঁকে তাঁর রাজ্যচ্যুত হতে হয় চূড়ান্ত অগৌরবের সঙ্গে। লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনে আরোহণের সময় সেন শাসকরা সমগ্র বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর শাসনকালে যে অসংখ্য সাহিত্যকর্ম তৈরি হয়েছিল তাতে লক্ষ্মণসেনের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পৃষ্ঠপোষকতা ও উদার মনোভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে সেন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তার উত্তরসূরিদের শাসন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কিছু অংশে সীমাবদ্ধ ছিল, যেখানে অন্যান্য স্থানীয় শাসকদের আবির্ভাব ঘটে।

১৩.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বিজয়সেনের সামরিক অর্জন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২. বল্লালসেনের রাজত্বকাল একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৩. লক্ষ্মণসেনের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে তাঁর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৪. কুলীনবাদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

১৩.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, 2011।

পল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, 1989।

একক ১৪ ❑ লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারীগণ

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ ভূমিকা

১৪.২ লক্ষ্মণসেনের উত্তরসূরিগণ

১৪.৩ পরবর্তী সেন শাসকরা

১৪.৪ সেন যুগের সমাপ্তি

১৪.৫ সারাংশ : সেন শাসকদের অবদান

১৪.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৪.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী বাংলার অবস্থা পর্যালোচনা করা।
- এই এককে দুটি মূল বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে :
  - পরবর্তী-সেন শাসকদের শাসন
  - বাংলায় সেন শাসনের অবসান
- বাংলার ইতিহাসে সেন রাজবংশের অবদান এই প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

১৪.১ ভূমিকা

লক্ষ্মণসেনের উত্তরসূরিরা লক্ষ্মণসেনকে সাধারণত সেন রাজবংশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্রাট হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর শাসনকালে বাংলা বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কিদের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে। তুর্কিদের সাথে যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও লক্ষ্মণসেন খুব বেশি প্রতিপত্তি হারায়নি। মিনহাজ উস সিরাজ তাঁর

D:\Suvendu\NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof\ (Dt. 18.03.2025)

তবাকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনকে বাংলার মহান রাজা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি তাঁকে সুলতান কুতুবুদ্দিনের সাথে তুলনা করেছেন।

১৪.২ লক্ষ্মণসেনের উত্তরসূরিগণ

লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র ছিল। বিশ্বরূপসেন ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পরবর্তী উত্তরসূরি। বিশ্বরূপ সেন কবে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিল তা আমাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। লক্ষ্মণসেন নিশ্চিতভাবে পূর্ব বাংলা শাসন করেছিলেন এমনকি আরও অন্তত তিন বা চার বছর—নদীয়া আক্রমণের পরও। দুটি ভূমি অনুদান পাওয়া গেছে যা মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বিজয়ের কয়েক বছর পর লক্ষ্মণসেন জারি করেছিল। এই প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগুলি পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের পরে মারা গিয়েছিলেন। বিপরীতে মিনহাজ উস সিরাজ তার *তবাকাৎ-ই-নাসিরী*তে উল্লেখ করেছেন যে নদীয়ায় অভিযানের পরপরই লক্ষ্মণসেন মারা যায়। কিন্তু *সদুক্তিকর্ণামৃত* ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের পরেও লক্ষ্মণসেনকে শাসক রাজা হিসাবে উল্লেখ করে। এই কারণে বাংলার সিংহাসনে বিশ্বরূপসেনের আরোহণের তারিখ এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

বিশ্বরূপসেনের রাজত্ব সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য নেই। তাঁর দুটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি মদনপাড়া তাম্রশাসন এবং দ্বিতীয়টি মধ্যপাড়া তাম্রশাসন। সমসাময়িক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুসারে মদনপাড়া তাম্রশাসন শাসক রাজার ১৪তম রাজত্বের বছরে জারি করা হয়েছিল। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মধ্যপাড়া তাম্রশাসন পরে জারি করা হয়েছিল। বিশ্বরূপসেনের শাসনকালের সময়কাল এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি।

বিশ্বরূপসেনের স্থলাভিষিক্ত হন তার ছোট ভাই কেশবসেন। তিনি তাঁর তৃতীয় রাজত্ব বছরে একটি তাম্রশাসন জারি করেছিলেন। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে লক্ষ্মণসেনের পর সিংহাসনে আসীন হন কেশবসেন, বিশ্বরূপসেন নয়। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কেশবসেনের তাম্রশাসনে বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসনের প্রাপ্ত সমস্ত শ্লোক এবং কিছু অতিরিক্ত শ্লোক রয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসন অনুশাসনে এই অতিরিক্ত শ্লোকগুলি রয়েছে। বিশ্বরূপসেনকে কেশবসেনের বড় ভাই এবং পূর্বসূরি হিসাবে বিবেচনা করার আসল ভিত্তি হল ইদিলপুর তাম্রশাসন অনুদানের ১০তম শ্লোক। আর. সি. মজুমদার অধ্যাপক এন.জি. মজুমদারের এই শ্লোকের ব্যাখ্যার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে এই তাম্রশাসন অনুসারে এটিতে রাজা বিশ্বরূপসেনের একটি উল্লেখ রয়েছে এবং তাই তিনি অবশ্যই কেশবসেনের আগে ছিলেন যিনি ইদিলপুর তাম্রশাসন জারি করেছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের তারিখের মতোই তাদের ভূখণ্ডের উপর পরবর্তী-সেনরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

করতে পেরেছিল তাও বিতর্কের বিষয়। সম্ভবত তাঁরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার কিছু অংশ শাসন করেছিল। মদনপাড়া এবং মধ্যপাড়া তাম্রশাসন অনুসারে বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের জমির দানের কথা উল্লেখ করে। কেশবসেন কর্তৃক জারি করা তাম্রশাসন দক্ষিণবঙ্গের জলাভূমির কথা উল্লেখ করে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগুলি বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে সেনের নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ করে। উভয় রাজাই সাম্রাজ্যিক উপাধি গ্রহণের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। বিশ্বরূপসেন 'অরিরাজ বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধি লাভ করেন এবং কেশব সেনও 'অরিরাজা অসহ্য শঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

সেন শাসকরা শৈব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন সম্ভবত সূর্য সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন। এই রাজাদের সূর্য উপাধিটি প্রমাণ করে যে তারা সূর্য উপাসক ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে যদিও এই দুই রাজার সামরিক শক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করে কিন্তু সেই বর্ণনাগুলো খুবই সাধারণ ভাষায়। এই দুই রাজার সাক্ষ্যে একটি সাধারণ শ্লোক রয়েছে। তাদের উভয়কেই 'যবনদের ধ্বংসকারী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত এই শ্লোকটি সেন শাসক এবং মুসলিম প্রধানদের মধ্যে লড়াইকে নির্দেশ করে। লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের পর মুসলিম প্রধানরা উত্তর ও পশ্চিম বাংলার একটি অংশে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মিনহাজ উস সিরাজের *তবাকাৎ-ই-নাসিরী* পরোক্ষভাবে সেন শাসক এবং মুসলিম প্রধানদের মধ্যে লড়াই সম্পর্কিত মতামতকে সমর্থন করেন। এতে বলা হয়েছে যে মুসলিম প্রধানরা 'লখনৌতির অঞ্চল' শাসন করতেন। যদিও 'বং' অর্থাৎ বঙ্গ বা পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ শাসন করেছিল লক্ষ্মণসেনের বংশধররা যখন এই রচনাটি রচিত হয়েছিল। এইভাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারি যে প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বাংলা লখানৌতির মুসলিম শাসকদের দ্বারা বিজিত হয়নি।

এই দুই রাজা সম্মিলিতভাবে অন্তত পঁচিশ বছর শাসন করেছেন। বেশিরভাগ গবেষক বিশ্বাস করেন যে তারা কমপক্ষে ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছেন। এই দুই রাজার উত্তরসূরি সম্পর্কে সঠিক কোনো সাক্ষ্য নেই। কিন্তু *তবাকাৎ-ই-নাসিরীর* মতে লক্ষ্মণসেনের বংশধররা বাংলায় (বাং) শাসন করেছে কমপক্ষে ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সম্ভবত ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে সেনদের আধিপত্য ছিল। এটা প্রায় নিশ্চিত যে বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন এর পর সেন বংশের সদস্যরা তাঁদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও তথ্য বিশদে পাওয়া যায় না। তবে তাদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি।

১৪.৩ পরবর্তী সেন শাসকরা

ঐতিহ্যগত সূত্রে লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন রাজাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এইগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য খুবই কম। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ *রাজাবলি*। এই গ্রন্থটি থেকে সেন শাসকদের বংশ তালিকা পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেন তার পরাজয়ের পর প্রায় দশ বছর পূর্ববঙ্গে সার্বভৌম শাসক হিসেবে শাসন করেন এবং তার উত্তরসূরিরা শাসক হিসেবে শাসন করেন। *রাজাবলির* পাঠে প্রদত্ত বংশগত সারণীতে

এটি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। দিল্লির অধীনস্ত হিসাবে ১০টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন— ১. কেশবসেন, ২. মাধবসেন, ৩. সুরসেন, ৪. ভীমসেন, ৫. কার্তিকসেন, ৬. হরিসেন, ৭. শত্রুঘ্নসেন, ৮. নারায়ণসেন, ৯. দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন এবং ১০. দামোদরসেন। এই পাঠ অনুসারে মাধবসেন রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন যখন তার পিতা কেশবসেন দিল্লির আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন। মাধবসেনের মৃত্যুর পর কেশবসেন দিল্লীর অধীনতা স্বাকীর করেছিলেন এবং কেশবসেনের অনুজ ভাই মাধবসেনের অধীনে রাঢ়ের শাসক হন। রাজাবলীতে নারায়ণসেনের পুত্র রূপে জয়সেনের উল্লেখ রয়েছে। জয়সেন রাঢ়ের শাসক রূপে ছিলেন। জয়সেনের সঙ্গে দ্বিতীয় লক্ষণসেনের সম্পর্ক ইতিহাসে স্পষ্ট নয়। দামোদরসেন ছিলেন সেন পরিবারের শেষ সদস্য যিনি দিল্লির অধীনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি চৌহান শাসক দ্বীপ সিংহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

এই ধরনের বিবরণ গুরুতর বিবেচনার যোগ্য নয় যদিও এতে কিছু নাম থাকতে পারে যাদের পরিচয় ঐতিহাসিক ছিল। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরিতে* পরবর্তী সেন শাসকদের কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। তবে আবুল ফজলও সম্ভবত *রাজাবলির* মতো একটি বিবরণের উপর নির্ভর করতেন। আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল মধুসেন ও মাদাসেনের নাম উল্লেখ করেছেন। রাজাবলিতে প্রদত্ত বংশতালিকায় উল্লেখিত রাঢ় অঞ্চলের রাজার মতোই মাদাসেন স্পষ্টতই একই। মধুসেন সম্ভবত রাজাবলি পাঠের মাধবসেনের সাথে অভিন্ন। *আইন-ই-আকবরিতে* একজন কেশুসেন ও একজন রাজা নওজার নামও উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এই দুটি নাম কেশবসেন এবং নারায়ণসেনের প্রতিনিধিত্ব করে।

তারানাথের বিবরণে চারজন সেন রাজার কথা উল্লেখ আছে যারা একসাথে প্রায় ৮০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারা হলেন—১. লাভাসেন, ২. কাসাসেন, ৩. মনিতাসেন এবং ৪. রথিকাসেন। এই চার রাজার পরে সেই চার রাজা ছিলেন যারা তারানাথের মতে অপ্রধান সেন রাজা ছিলেন। তারা হলেন—১. লাভাসেন, ২. বুদ্ধসেন, ৩. হরিতসেনা এবং ৪. প্রতিতসেন। তারানাথ তাদের তুরুস্ক শাসকদের অধীনস্থ শাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর উপরে উল্লিখিত নামের কাউকেই বঙ্গ শাসনকারী সেন রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করা যায় না।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সেন বংশের পতনের একমাত্র কারণ তুর্কি আক্রমণ নয়। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডোম্বল-পাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুন্দরবন অঞ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কি আক্রমণের ফলস্বরূপ সেনদের রাজনৈতিক , প্রশাসনিক ও সামরিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়লে আরো কয়েকটি অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায়। ১২২১ খ্রিঃ এর পূর্বে পট্টিকেরা রাজ্যে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব তাঁর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায়ের অনুমান মেঘনার পূর্বতীরে ত্রিপুরা নোয়াখালি-চট্টগ্রামে দেববংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেববংশের উত্থান সম্ভবত লক্ষণ সেনের সময়ই হয়েছিল। ১২৮৩ খ্রিঃ এর মধ্যে দেববংশের রাজা দশরথ দেব ঢাকা জেলা দখল

করেন এবং বিক্রমপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ তুর্কি শাসন মুক্ত ছিল।

১৪.৪ সেন যুগের সমাপ্তি

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সেন শাসন শেষ পর্যন্ত কীভাবে এবং কখন শেষ হয়েছিল তা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আক্রমণ যে রাজ্যটিকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছিল তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যাইহোক, পরবর্তী সেন শাসকরা অন্তত ১৩ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের শাসন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক এবং লিখিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে খ্রিস্টীয় ১৩ শতকের তৃতীয় পাদে, দেব শাসকরা বিক্রমপুরের উপর তাদের দখল কায়েম করে এবং সেন শাসকদের সরিয়ে দেয়। শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র বাংলা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৪.৫ সারাংশ : সেন শাসকদের অবদান

বাংলায় সেনদের শাসন সাধারণত হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে গোঁড়া হিন্দুধর্মের উত্থানের সাথে জড়িত। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় এই দুটি দুটি ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল যার ফলে উভয়ের মিলনের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বাংলায় বৌদ্ধদের উপর আক্রমণ এই সময়ের মধ্যে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে বৌদ্ধরা প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অভিবাসন করেছিল। কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন বাংলায় ধর্মীয় সহাবস্থানের যে ঐতিহ্য ছিল সেন রাজবংশের সময় তা কিছুটা হলেও বিনষ্ট হয়। সেনদের ধর্মীয় অনুদার নীতি পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসারের পথে উন্মুক্ত করেছিল কি না সেই প্রশ্নও কেউ কেউ তুলেছেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই কথা বলা যায় যে সেন রাজবংশ সমগ্র বাংলাকে একটি শাসনের আওতায় এনেছিল। পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেল—বাংলার এই ছ-টি উপবিভাগ সেন বংশের সময় ঐক্যবদ্ধ হয়। সেন যুগ সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশের সাক্ষী ছিল। এই যুগে *দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর* রচিত হয়েছিল। বল্লালসেন 'অদ্ভুতসাগর' রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। লক্ষ্মণসেন তা সমাপ্ত করেন। জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, শ্রীধরদাস, হলায়ুধ মিশ্র এবং গোবর্ধন ছিলেন সেই সময়ের সাহিত্যিক। সেন রাজা ও রাজদরবারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটে।

১৪.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. লক্ষ্মণসেনের পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে লিখুন।

২. প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে সেন রাজবংশের অবদান কী ছিল?

১৪.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

পল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

পর্যায়-৫

প্রশাসন

একক ১৫ ❑ প্রশাসনের রূপরেখা : মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিবর্তন

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ ভূমিকা

১৫.২ গুপ্ত-পূর্ব যুগে প্রশাসন

১৫.৩ গুপ্ত এবং গুপ্ত পরবর্তী সময়কাল

১৫.৪ পাল ও সেন শাসকদের অধীনে প্রশাসন

১৫.৫ উপসংহার

১৫.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৫.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল :

- প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক বিবর্তন অনুধাবন করা।
- তিনটি দিক থেকে এই বিষয়টি আলোচিত হবে :
  - প্রাক্-গুপ্ত প্রশাসনিক কাঠামো
  - গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো
  - পাল ও সেন যুগে বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো

১৫.১ ভূমিকা

প্রাচীনকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চল নিয়ে 'বাংলা' ভূমি ছিল। এই ভূখণ্ডে বাংলাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এর আধিপত্য কামরূপ (আসাম), পাটলিপুত্র (পাটনা) এবং ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা) থেকে মধ্য ভারতের এরানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন বাংলার বিদ্যমান রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং

D:\Suvendu\NSOU\NEP/ NEC-HI-01 (History)
Unit- 1-15 \ 3rd Proof\ (Dt. 18.03.2025)

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি রূপরেখা আঁকা সত্যিই একটি কঠিন কাজ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া কঠিন। বাংলায় প্রশাসন সবসময় একই থাকেনি। প্রতিটি নতুন বিজয়ের পরে প্রশাসনের নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ধ্রুপদী বিবরণ এবং বিক্ষিপ্ত উল্লেখগুলির বিশদ অধ্যয়ন থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

১৫.২ গুপ্ত-পূর্ব যুগে প্রশাসন

প্রাক-মৌর্য যুগে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। পরবর্তী সাহিত্যে সংরক্ষিত কয়েকটি গল্প এবং কিংবদন্তির প্রমাণ এবং ধ্রুপদী বিবরণ থেকে একটি মোটামুটি রূপরেখা তৈরি করা যেতে পারে; আমরা জানি যে রাজতন্ত্র ছিল সরকারের প্রচলিত রূপ। গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখকরা খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধে গঙ্গারিডি (গঙ্গা অঞ্চলের মানুষ) নামে পরিচিত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যেটি সামরিকভাবে শক্তিশালী ছিল। সুশৃঙ্খল এবং উচ্চতর সামরিক শক্তির সাথে গঙ্গারিডি রাজ্যের বর্ণনাটি রাষ্ট্র সংস্থার একটি অত্যন্ত উন্নত রূপ নির্দেশ করে বলে মনে হয়। গঙ্গারিডিই রাজ্য ছাড়াও, সমসাময়িক বাংলায় বেশ কিছু রাজত্ব বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়, শুধুমাত্র তাদের নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। গঙ্গারিডাইয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করা খুব কঠিন। মহাভারতে বলা হয়েছে যে সেই শক্তিগুলির তাদের সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং তারা বিদেশি রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিল। সম্ভবত বাংলা শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, যা একটি শক্তিশালী, সুনিয়ন্ত্রিত এবং প্রাজ্ঞ প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা চিহ্নিত ছিল। যদিও আমরা সাধারণভাবে বাংলায় মৌর্য প্রশাসনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানি তবে দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় তাদের প্রশাসন সম্পর্কে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। মৌর্যদের পতনের পর থেকে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাংলায় যে স্বাধীন রাজ্যের বিকাশ ঘটেছিল, সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই। তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে মৌর্যদের দ্বারা গড়ে ওঠা প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা বাংলায় প্রচলিত ছিল।

মহাস্থান শিলালিপি থেকে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর অন্তর্গত), আমরা জানি যে পুণ্ড্রনগর শহরটি সম্ভবত মৌর্যদের আমলে একটি মহামাত্রের প্রশাসনিক আসন ছিল। মহাস্থান শিলালিপি থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়েছিল নাকি সম্রাটের সরাসরি প্রশাসনের অধীনে ছিল। শিলালিপির বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে একটি সুসংগঠিত প্রশাসনের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে মৌর্য রাজবংশের অবসান ঘটেছিল। এরপর বাংলার রাজনৈতিক অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়।

মৌর্য-পরবর্তী শিলালিপিগুলি থেকে এটা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় শাসকরা শাসন করত। কখনও কখনও সাম্রাজ্যিক পরিবারের শাসনের ইঙ্গিতও শিলালিপিগুলি থেকে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে গুপ্ত শাসনের ভিত্তির সাথে, দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয় এবং বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগের সূচনা হয়, যা মৌর্য প্রশাসনের মূল সুর। স্থানীয় রাজবংশ বা শাসকদের মধ্যে যারা বাংলার অভ্যন্তরে অঞ্চলগুলিতে শাসন করেছিলেন, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকের বর্মণ এবং সমতটের খড়্গগণ (সপ্তম শতাব্দী) গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। আমরা বঙ্গ অঞ্চলের স্থানীয় প্রধানদের নামও পাই যেমন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব; কর্ণসুবর্ণের জয়নাগ এবং তিপেরার বৈন্যগুপ্ত।

১৫.৩ গুপ্ত এবং গুপ্ত পরবর্তী সময়কাল

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে, প্রচলিত রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে রাজা সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মহারাজা উপাধি গ্রহণ করতে পারেন। বাঁকুড়া জেলার পুষ্করানা বা বর্তমান পোখরানার সিংহবর্মণ এবং তাঁর পুত্র চন্দ্রবর্মণ মহারাজা উপাধি ভোগ করতেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আর্যাবর্তের অন্যতম শক্তিশালী শাসক হিসেবে চন্দ্রবর্মণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দামোদরপুর তাম্রশাসন (সময়কাল ৪৪৪ খ্রি:, ৪৪৮ খ্রি:, ৪৮২ খ্রি: এবং ৪৭৬-৪৯৫ খ্রি:) অনুসারে গুপ্ত সম্রাটরা পরমাদিত্য পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করতেন। গুপ্ত সম্রাটরা সমগ্র বাংলাকে সরাসরি শাসন করতেন, যা তাদের সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

বাংলার স্থানীয় শাসকদের মধ্যে, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) এবং জয়নাগ (আনু. ষষ্ঠ শতাব্দী) মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। শশাঙ্কও একই উপাধি ব্যবহার করেছেন। বেশ কিছু সামন্ত প্রধান ছিলেন যারা মহারাজা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। গুনাইঘর তাম্রলিপিতে (১৮৮ খ্রি:) বলা হয়েছে যে মহারাজা বৈন্যগুপ্তের অধীনে দুই সামন্ত প্রধান ছিলেন, মহারাজা রুদ্রদত্ত এবং মহারাজা মহাসামন্ত বিজয়সেন, কিছু সামন্তদের দ্বারা মহাসামন্ত এবং মহারাজার মতো উপাধি ব্যবহার নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করে যে অঞ্চলের কিছু অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। একই শিলালিপিতে, বিজয়সেনের বিভিন্ন উপাধি যেমন দূতক, মহাপ্রতিহার, মহাপিলুপতি, পঞ্চাধিকারপরিক, পট্টপরিকা এবং পুরপালপারিকা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। এই ধরনের উপাধির ব্যবহার অবশ্য রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে একজন সামন্ত প্রধানের দখলে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পদের কথা স্পষ্টভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে স্বাধীন রাজ্যের কিছু অংশের প্রশাসনে সামন্ত প্রধানরা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন।

উদাহরণ স্বরূপ, মহারাজা বিজয়সেন (মল্লাসারুল তাম্রশাসনের শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ), তার নিজের সীলমোহর ব্যবহার করতেন এবং তার আধিকারিকদের নির্দেশ জারি করতেন।

গুপ্ত সম্রাটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাংলার সাম্রাজ্য অঞ্চলকে কিছু সুসংজ্ঞায়িত এককে বিভক্ত করা হয়েছিল যেমন ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি এবং গ্রাম ইত্যাদি। প্রতিটি এককের সদর দপ্তরে নিজস্ব একটি অধিকরণ (office) থাকত যা অধিস্থান নামে পরিচিত। ভুক্তি, একটি আধুনিক বিভাগের সাথে তুলনীয়, প্রশাসনের বৃহত্তম একক ছিল এবং রাজার একজন সহযোগী দ্বারা শাসিত হত। গুপ্ত যুগে সম্রাট স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করতেন। তার উপাধি ছিল উপরিক-মহাকাজ। সমসাময়িক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে আমরা পুণ্ড্রবর্ধন এবং বর্ধমান নামে এই ধরনের ভুক্তির নাম জানি, যা যথাক্রমে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের সাথে সম্পর্কিত। গুপ্ত শিলালিপিতেও আমরা একটি নামহীন ভুক্তির উল্লেখ পাই যার সদর দপ্তর ছিল নব্যাবকাশিকায়, যার মধ্যে সুবর্ণবীথিও ছিল। গুপ্ত শাসকদের দামোদরপুর তাম্রশাসনের শিলালিপিতে, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসককে 'তত্পদপরিগ্রহিতা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে রাজার অধীনে তিনি চাকরি করতেন। প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার উপাধি ছিল উপারিকা এবং বুধ গুপ্তের রাজত্বকালে মহারাজা এতে যোগ করা হয়েছিল। দামোদরপুর তাম্রশাসনের শিলালিপিতে উপারিকা মহারাজা মহারাজপুত্র দেব ভট্টারকের উল্লেখ থেকে পাওয়া যায় ৫৪৩ খ্রি:-এ। এটা অনুমান করা যেতে পারে যে কখনও কখনও রাজপুত্র বা রাজপরিবারের একজন সদস্যকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হতো। যাইহোক, একজন প্রাদেশিক শাসক কীভাবে তার প্রশাসন পরিচালনা করেছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের কাছে খুব কম তথ্য রয়েছে। পাহাড়পুর তাম্রশাসন (গুপ্তরাজত্বের ১৫৯ বর্ষে বা ৪৭৯ খ্রি:) থেকে জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধনের ভুক্তির অধিকরণ (সদর দপ্তর) ছিল পুণ্ড্রবর্ধন শহরে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাদেশিক শাসক সরাসরি রাজার কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন কারণ তার নিয়োগ রাজার পছন্দ বা অনুমোদন সাপেক্ষে ছিল। ভুক্তির পরেই ছিল বিষয়, দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রশাসনিক একক, যা প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বিষয়গুলি আধুনিক জেলার সাথে তুলনীয়। একটি বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী এবং পরবর্তী গুপ্ত যুগে যথাক্রমে কুমারমাত্য এবং আয়ুক্তক নামে পরিচিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের উপর পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের আধিপত্যের সময়, আদি বিষয়ের শাসকদের বলা হত বিষয়পতি।

সাধারণত একজন ভুক্তির শাসক তার প্রদেশের বিষয়ের জেলা বা বিষয়ের প্রধানদের নিয়োগ করেন। বৈগ্রাম তাম্রশাসনের শিলালিপি অবশ্য বিষয়ের একজন কর্মচারীর কথা উল্লেখ করেছে। যিনি ভট্টারকের কাছে সরাসরি দায়ী ছিলেন। এতে দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্রাট বিষয়ের শাসক নিয়োগ করতেন। যাইহোক, একজন ভুক্তির শাসক সাধারণত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার শাসনকর্তাকে নিয়োগ করতেন।

সমসাময়িক শিলালিপিতে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের একজন কর্মচারীর কথা উল্লেখ করেছে। দামোদরপুর তাম্রশাসনের শিলালিপি নং ১, ২, ৪ এবং ৫ পুণ্ড্রবর্ধনের ভুক্তির অধীনে কোটিবর্ষবিষয়র নাম প্রথম

কুমারগুপ্তের ধনাইদহ তাম্রশাসনে (৪৩২-৪৩৩ খ্রি:) খাটাপাড়া বা খাদাপারা-বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। বৈগ্রাম তাম্রশাসনের শিলালিপিতে একটি বিষয়ের অস্তিত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেখানে পঞ্চনগরীকে সদর দপ্তর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এই বিষয় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির আওতাধীন ছিল। ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের ফরিদপুর তাম্রশাসনে ভারকমণ্ডল নামক একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

দামোদরপুর তাম্রশাসনের শিলালিপি (নং ১-৫) থেকে এটি স্পষ্ট বলে মনে হয় যে অধিকরণ ছিল বিষয় বা জেলার শাসকের সদর দপ্তর এবং তাঁর অধীনে একাধিক কর্মচারী কাজ করত। কর্মচারীদের মধ্যে দলিল/নথিপত্র রক্ষক (পুস্তপাল) জমি লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলে জানা গেছে। শিলালিপিগুলিই জমির অনুদান বা বিক্রয় এবং এতে অধিকরণের নব্যবাকাশিকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ছিল। শিলালিপিগুলি ছিল ভূমি সম্পর্কিত তথ্যের একমাত্র উৎস। সম্ভবত অধিকরণের কর্তব্য শুধু জমির লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে গেলে যা যা করা প্রয়োজন, অধিকরণ সম্ভবত সেই কাজগুলি করত। দুর্ভাগ্যবশত প্রমাণের অভাবের কারণে তাদের অন্যান্য সম্ভাব্য কার্যাবলী নির্ধারণ করা যায় না। দামোদরপুর তাম্রশাসনের ২, ৪ এবং ৫ থেকে কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিকরণ সম্পর্কে জানা যায়। কোটিবর্ষ নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখন বাণগড় নামে পরিচিত। তাম্রশাসন থেকে জানা যায় কোটিবর্ষ বিষয়ের একজন বিষয়পতি ছিল, তিনি ছিলেন অধিকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী। বিষয়পতি ছাড়া কোটিবর্ষ বিষয়ের আরো চারজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম স্বার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম কায়স্থ। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই চারটি পদবীর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা কঠিন। সম্ভবত, প্রথম তিনটি ধনী মহাজন, বণিক ও শিল্পীগণের প্রতিনিধি রূপে অধিকরণের সদস্য ছিলেন। এই সময়কালে কায়স্থ শব্দে লেখক ও একশ্রেণির রাজকর্মচারী বোঝাতো। প্রাচীন যুগে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বৃত্তির নিজস্ব সংঘ বা Guild থাকত। এই সংখ্যাগুলির প্রধানরাই অধিকরণের সদস্য হতেন। বিষয়পতিরা অধিকরণের সকল সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

ধর্মাদিত্যের রাজত্বকালে তৃতীয় বছরে জারি করা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় বিষয়পতির অধিকরণ ছাড়াও বিষয়ের অগ্রগণ্য মানুষদের নিয়ে বিষয় মহত্তর গঠিত হত। এর নিচে ছিল অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণদের গঠিত পুরোগো প্রকৃতি। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন 'পুরোগো' শব্দ বন্ধটি যে সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত তাঁরা গুরুত্বের দিক থেকে কিছু কম ছিল না। তিনি মন্তব্য করেছেন, "...the word 'puroga' used after the names and designations of the additional members would rather seen to indicate that they formed an integral part of the adhikarana and possessed rights and prerogatives beyond those of the mere advisers. Although their exact constitutional position is difficult to determine, it would not be unreasonable to assume that they held concurrent authority with the district-offices in the general administration or at least in specified branches of it." এর থেকে অনুমান করা সম্ভব যে প্রাচীন

বাংলায় শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজের জনসাধারণের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হত। স্থানীয় সমাজগুলি যে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করত তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

জেলার পাশেই, বীথির প্রশাসন প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বীথি শব্দটির সঠিক অর্থ অস্পষ্ট বলে মনে হয়। কখনও কখনও এটি ভুক্তি বা একটি মণ্ডলের একটি উপবিভাগের সাথে মিলে যায়। বেশ কিছু শিলালিপিতে এই প্রশাসনিক এককের উল্লেখ করে। সমাচারদেবের ঘুগরাহাটি শিলালিপিতে উল্লেখিত সুবর্ণবীথির অর্থ নব্যাবকাশিকায় অবস্থিত "সোনা/রূপোর বাটের বাজার" হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। প্রশাসনিক একক অর্থে বীথির ব্যবহার মল্লাসারুল তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। একই শিলালিপিতে আমরা বর্ধমানভুক্তিতে ভক্কট্টকবীথি নামে পরিচিত একটি বীথির উল্লেখ পাই। গুপ্ত যুগের পাহাড়পুর তাম্রশাসনের শিলালিপিতে বীথির আরেকটি উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে এটি লিপিবদ্ধ আছে যে দক্ষিণাংশকবীথি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির আওতাধীন ছিল। আমাদের কাছে বীথিদের অধিকারের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে, তবে তাদের শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। জমি লেনদেন সংক্রান্ত দায়িত্ব বীথির অধিকরণের উপর অর্পিত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শৈথিল্য শুরু হয় পঞ্চম শতক থেকে। সুকুমার সেনের মতে এর ফলে শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় যে সায়ত্বশাসন প্রচলিত ছিল তা বিনষ্ট হয়। গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলায় রাজা বলতে যে বোঝায় তা সম্ভবত ছিল না। দলপতি বা দেশ-অধিকারী যারা ছিলেন তাদের ক্ষমতা প্রশ্নহীন ছিল না। গুপ্ত শাসনের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে ভুক্তিপতি, বিষয়পতি ও মণ্ডলপতিরা স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে নিজেদের ক্ষমতা সংহত করে এবং কখন কখন মহারাজ উপাধি গ্রহণ করতে থাকে। এই সময় তাঁরা নামমাত্র মহারাজাধিরাজের উপাধি গ্রহণ করে। এই সময় আরো একটি গভীর সামাজিক পরিবর্তন বাংলায় হয়েছিল। গুপ্ত শাসনের সময় থেকে উত্তর ভারত থেকে বেদপন্থী ব্রাহ্মণদের আগমন ও বসতি শুরু হয়। এরা বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় মতাদর্শগত স্তরে প্রভাব ফেলে। এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বেদ-বিদ্যাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা। সুকুমার সেনের অনুমান বিষয়পতি, ভুক্তিপতিদের ক্ষমতা দখলে এই ব্রাহ্মণশ্রেণির প্ররোচনা ছিল।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে ধীরে ধীরে মহারাজ উপাধিক উপরিকদের অধীনে অধিষ্ঠান-অধিকরণের গৌবর বহুলাংশে হ্রাস পায়। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের তাম্রশাসনগুলি থেকে এই তথ্য স্পষ্ট যে গুপ্ত শাসনের শৈথিল্যের কারণে বাংলায় শাসন বিচার ব্যবস্থায় অধিষ্ঠানিকরণের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গ্রামগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। তারা সম্ভবত প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম একক গঠন করেছিল। সমসাময়িক শিলালিপিতে সাধারণত গ্রাম-সহ গ্রামের নামের প্রত্যয় যুক্ত থাকে, আবার কিছু নাম অগ্রহার শব্দ দিয়ে শেষ হয়। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসনে গুনেকাগ্রহ গ্রামের অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে। ১৬৯ গুপ্ত যুগ (বা ৪৮৮ খ্রি:)-এর নন্দপুর অনুশাসনে অম্বিলা গ্রাম অগ্রহারের পরিচয় মেলে। মনে হয় যে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অগ্রহারকে (৫০৭ খ্রি:) গ্রামের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হত। প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে গ্রামের সমন্বয় প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। বুধ গুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসনে পলাশা বৃন্দাকের নামের উল্লেখ আছে (৪৮২ খ্রি:),

যার ক্ষেত্রফল গ্রামের সাধারণ ক্ষেত্রফলের চেয়ে বড় বলে মনে হয়। গুপ্ত যুগের (গুপ্ত শাসনের ১২৮তম বছরে) বৈগ্রাম তাম্রশাসনে সম্ভবত ছোট ছোট গ্রামের মিলনের উদাহরণ পাওয়া যায়। এটি ভাই-গ্রাম বলে উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় ত্রিব্রত এবং শ্রীগোহালির মতো দুটি পৃথক এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

একটি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এর প্রশাসন বা স্থানীয় বিষয়ে জড়িত ছিলেন। তাদের ভূমিকা অবশ্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিষয় বা বীথির অধিকারীকরণের বিষয়ে আমরা মহত্তর এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের একটি সমান্তরাল ক্ষেত্র খুঁজে পেতে পারি। গ্রামীক যে প্রতিটি গ্রামে প্রশাসনের প্রধান ছিলেন এই তত্ত্বটি সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে। তাম্রশাসন বা অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে গ্রামীকদের দ্বারা পরিচালিত গ্রামগুলিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি রূপে কারা থাকত। পাহাড়পুর তাম্রশাসনের থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ, কুটুম্বিন এবং মহত্তররা বেসরকারী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করত। বুদ্ধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রলিপিতে (আনুমানিক ৪৭৬-৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করা হয়েছে যে চন্দগ্রাম গ্রামের প্রশাসনে অ-সরকারি সদস্যদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রজাদের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এছাড়াও কুটুম্বিনরা (প্রধান ব্রাহ্মণ, বিশিষ্ট প্রজা এবং গৃহকর্তা)। যাইহোক, এই ধরনের গ্রামগুলির প্রশাসনের প্রকৃতি অন্যদের থেকে আলাদা ছিল যেখানে ক্ষমতাগুলি শুধুমাত্র স্থানীয় মহত্তর এবং কুটুম্বিনদের হাতেই অর্পিত ছিল না, বরং অষ্টকুলাধিকরণ এবং গ্রামীকার কাছেও ন্যস্ত ছিল। এই শ্রেণির অন্তর্গত গ্রামগুলির নিজস্ব অধিকার ছিল, যা সরকারী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করত। এই ধরনের একটি অধিকার সম্ভবত আট ব্যক্তি এবং গ্রামিকা নিয়ে গঠিত। এই ধরনের গ্রামে, দলিল বা নথি-রক্ষকদের একটি দপ্তর ছিল বলে মনে হয়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার স্বাধীন শাসকদের অধীনে একটি গ্রাম অধিককরণের বিষয়ে আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। তবে, গ্রামীণ অধিকরণের নিয়ম-কানুন বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে।

১৫.৪ পাল ও সেন শাসকদের অধীনে প্রশাসন

পাল শাসকদের দীর্ঘ শাসনের অধীনে থাকার সময় বাংলা প্রথমবারের মতো একটি স্থিতিশীল সরকারের অভিজ্ঞতা লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত প্রাপ্ত উপকরণ থেকে পাল প্রশাসনের বিশদ বিবরণ প্রদান করা কঠিন। আমরা শুধুমাত্র এর বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। পাল রাজাদের শাসনকালে গুপ্ত প্রাদেশিক প্রশাসনের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বাংলায় কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের রাজতান্ত্রিক রূপ পুরো সময় জুড়ে বিরাজ করে। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সাধারণত উত্তরাধিকারী (যৌবরাজ্যম) বোঝানো হতো। যুবরাজের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদের কাছে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। গুপ্ত যুগের মতো, রাজার পুত্রের ক্ষেত্রে কুমার শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাকে প্রাদেশিক শাসকের মতো একটি উচ্চ প্রশাসনিক পদ দেওয়া হয়েছিল। কখনও কখনও কুমাররা শাসক রাজার সামরিক অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

সাম্রাজ্য পরিচালনার কাজে, রাজাকে একদল রাজকর্মচারী সাহায্য করতেন যাদের প্রধান ছিলেন মন্ত্রীরা যারা মন্ত্রী বা সচিব নামে পরিচিত। পাল রাজাদের শাসনকালে আমরা নথিপত্রে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীর উল্লেখ পাই যার অবস্থান প্রধানমন্ত্রীর মতোই ছিল। এই পদের উচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদার কথা দেবপালের বাদল প্রশস্তিতে বলা হয়েছে। মনে হয় ধর্মপালের সময় থেকেই ব্রাহ্মণ গর্গের পরিবারে প্রধানমন্ত্রীর পদটি বংশগত ছিল। গর্গের বংশধররা (যেমন ধর্ভপানি, সোমেশ্বর, কেদারমিশ্র এবং গুরবমিশ্র) পরবর্তী একশ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও সুসংহতকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তী পাল রাজাদের সময় দ্বিতীয় একটি পরিবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন। যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর উত্তরসূরি বৈদ্যদেব কুমারপালের রাজত্বকালে একই পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রধানতম রাজকর্মচারীগণের ক্ষেত্রে বংশগত নীতি পরবর্তী রাজবংশ যেমন—চন্দ্র এবং যাদবদের অধীনেও চালু ছিল বলে মনে হয়। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তির প্রমাণ তা প্রমাণ করে।

পাল সম্রাটদের নিয়ন্ত্রণে অসংখ্য সামন্তপ্রধান ছিল। পাল সাক্ষ্যে এদেরকে রাজন, রাজন্যক, রণক, সামন্ত ও মহাসামন্ত ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপাধিগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কিন্তু এটা মোটামুটি বলা যায় যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য করেছিল। কখনও কখনও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতা তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করতে প্ররোচিত করত। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের জন্য চৌদ্দজন সামন্তের কাছে রামপালের সাহায্য চাওয়ার ঘটনা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে পাল রাজাদের ক্ষমতা অনেকাংশে সামন্ত প্রধানদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

পালদের শাসনকালে, পূর্ববর্তী যুগের প্রশাসনিক একক যেমন—ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রতর এককগুলি বহাল ছিল। পাল সাক্ষ্যে উল্লেখিত ভুক্তিগুলি হল বাংলায় পুণ্ড্রবর্ধন, বর্ধমান ও দণ্ডভুক্তি, উত্তর বিহারে তির-ভুক্তি, দক্ষিণ বিহারে শ্রীনগর-ভুক্তি এবং আসামে প্রাগজ্যোতিষ-ভুক্তি। পাল শিলালিপিতে বিপুল সংখ্যক সাক্ষ্যেও মণ্ডলের নাম লিপিবদ্ধ আছে। ইতিহাসবিদরা এই বিষয়ে একমত যে বাংলার শাসককুল যেমন পাল, সেন, চন্দ্র এবং দেব-এর তাম্রশাসনগুলি বিশ্লেষণ করলে স্থানীয় স্তরের প্রশাসনিক একক মণ্ডলের অস্তিত্ব দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী দেখিয়েছেন প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত এককগুলি বিশেষত বিষয় এবং মণ্ডল, কোনো একটি নির্দিষ্ট উপ-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না। বীথি নামক প্রশাসনিক একক, যা মণ্ডল ও গ্রামের মধ্যবর্তী বলে ধরা হয়। এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ শাসকদের জারি করা একটি লিপিতে। বঙ্গ উপ-অঞ্চলের বাইরে বীথির অস্তিত্ব আমাদের নজরে এসেছে মল্লাসারুল তাম্রশাসন থেকে ৭০০ খ্রিঃ থেকে ১৩০০ খ্রিঃ পর্যন্ত জারি করা জমিদান সংক্রান্ত নথিগুলি থেকে প্রশাসনিক এককগুলির কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। শুধু মাত্র পাল যুগের কিছু সাক্ষ্য থেকে পূর্ব বিহার এবং উত্তরবঙ্গের বীথির উল্লেখ পাওয়া যায়।

একাদশ শতকের পর থেকে নতুন কয়েকটি প্রশাসনিক এককের সন্ধান সমকালীন সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়। যেমন মণ্ডল (আধুনিক খণ্ড বা Segment) এবং পাটক। ষষ্ঠ শতকে বৈন্যগুপ্তের সময় 'পাটক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন পাটক বলতে বোঝাত ভূমি পরিমাপের একক। কিন্তু দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে সেন সাক্ষ্যে পাটক বলতে একটি প্রশাসনিক একক বোঝানো হয়েছে। প্রশাসনিক একক হিসেবে পাটক মণ্ডলের তুলনায় ছোট এবং নিচে। রণবীর চক্রবর্তী বিভিন্ন তাম্রশাসনে উল্লিখিত কয়েকটি পাটকের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন শক্তিপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত নিমাপাটক, মাধাইনগর তাম্রশাসনে উল্লিখিত দাপনিয়পাটক, ইদিলপুর তাম্রশাসনে তলপাড়াপাটক ইত্যাদি। খণ্ডল নামক প্রশাসনিক এককটি মণ্ডল-এর উপ-একক রূপে বিকশিত হয়েছিল। প্রশাসনিক এককের সব চাইতে তলায় ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধান ছিলেন গ্রামিক। অষ্টকুলাধিকরণ, বীথি, খণ্ডল এবং মণ্ডল-এর মাধ্যমে গ্রামের সঙ্গে উচ্চতম প্রশাসনের সংযোগ থাকত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা বা সম্রাটের ক্ষমতাকে সার্বভৌম মনে করা হত। রাজা শুধুমাত্র শাসন করতেন (অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজস্ব আদায় করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য ও প্রজাদের রক্ষা করা ইত্যাদি) তাই নয়, সমাজ ও ধর্মের বিভিন্ন বিষয়েও তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। সাধারণভাবে পাল শাসকগণ ধর্মীয় বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করতেন। যেমন ধর্মপাল বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাঁর রাজ্যে হিন্দু প্রজাগণ নিজ ধর্ম অনুসারে চলতেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পাল শাসকদের প্রধানমন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। এর থেকে অনুধাবন করা যায় যে পাল শাসকরা ধর্মীয় পরিচয়ের থেকে যোগ্যতার প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

পাল সম্রাটগণ গুপ্ত সম্রাটদের মতো বিভিন্ন অলঙ্কারিক উপাধি ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। এই জাতীয় উপাধিগুলি ছিল পরমেশ্বর পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি। এই উপাধিগুলো ছিল তাদের ক্ষমতা ও গৌবরের প্রকাশ, তাদের শাসনকে বৈধ করার প্রয়াস। পাল যুগের তাম্রশাসনগুলো থেকে রাজকর্মচারীদের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় পালদের রাজ্যশাসন প্রণালী যথেষ্ট বিধিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শাসন প্রণালীর যে রূপরেখা দেওয়া আছে পাল শাসকগণ মোটের উপর তাই অনুসরণ করতেন।

কেন্দ্রীয় শাসন : রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে পাল শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় স্থলে ছিলেন রাজা। তাঁকে সাহায্য করতেন প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও অমাত্যরা। রাজা প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও অমাত্যদের নিয়ে গঠিত ছিল কেন্দ্রীয় শাসন বিকাশ। রাজা স্বয়ং এই বিভাগ পরিচালনা করতেন। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক' নামক একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন যার দায়িত্ব ছিল অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা করা, 'দূত'-কে প্রধান কমচারী বলে গণ্য করা হত। 'দূত'-এর দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা। 'রাজস্থানীয়' ও 'অঙ্গরক্ত' নামক দুজন অমাত্যের কথা জানা যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুমান অনুসারে এরা সম্ভবত যথাক্রমে রাজার প্রতিনিধি ও দেহরক্ষীর দলের

নায়ক ছিলেন। পালরাজগণের লিপিতে এবং রামচরিতে যুবরাজের উল্লেখ রয়েছে—যুবরাজের দায়িত্ব ছিল রাজাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা।

রাজস্ব বিভাগ : পাল শাসনে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হত। এরজন্য সুনির্দিষ্ট রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হত, যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল রাজস্ব বিভাগ। কৃষিক্ষেত্র ছিল কর আদায়ের প্রধানতম ক্ষেত্র। পাল আমলে উৎপন্ন শস্যের উপর নানা ধরনের কর ধার্য করা হত। যেমন—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উপরিকর ইত্যাদি, সম্ভবত গ্রামপতি ও বিষয়পতিরা এই করগুলি সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামক একজন কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি অনুসারে কতকগুলি পণ্যের উপর রাজার এক-ষষ্ঠাংশ কর প্রাপ্য ছিল। এই কর্মচারীর দায়িত্ব ছিল এই জাতীয় কর আদায় করার। এছাড়া আরো কিছু রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাল যুগের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। যেমন চৌরোদ্ধরণিক (দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষা করার জন্য দেয় কর যিনি আদায় করতেন), শৌল্কিক (বাণিজ্যদ্রব্যের শুল্ক যিনি আদায় করতেন), দাশাপারাধিক (চুরি প্রভৃতি অপরাধের অর্থদণ্ড যিনি আদায় করতেন) এবং তরক (খেয়াঘাটের মাশুল যিনি আদায় করতেন)।

হিসাব ও দলিল বিভাগ : 'মহাক্ষপটালিক' ও 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' সম্ভবত এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

জরিপ বিভাগ : পাল যুগে নির্দিষ্ট জরিপ বিভাগ ছিল যার দায়িত্বে ছিলেন 'ক্ষেত্রপ' ও 'প্রমাতৃ' প্রমুখ।

বিচারবিভাগ : 'মহাদণ্ডনায়ক' অথবা 'ধর্ম্মাধিকার' বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

সুরক্ষা বিভাগ : 'মহাপ্রতীহার', 'দাণ্ডিক', দাণ্ডপাশিক' ও দণ্ডশক্তি সম্ভবত সুরক্ষা বা পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন।

সৈনিক বিভাগ : এই বিভাগটির প্রধান ছিলেন সেনাপতি অথবা মহাসেনাপতি। মোট পাঁচটি ভাগে সৈন্য বাহিনী বিভক্ত ছিল :

ক. পদাতিক

খ. অশ্বারোহী

গ. হস্তী

ঘ. উষ্ট্র

ঙ. রণতরী

এই প্রতিটি বিভাগের একজন করে প্রধান থাকতেন। দুর্গ রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন 'কোট্টপাল'। পাল শাসকগণ সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য 'প্রান্তপাল' নামক পদ সৃষ্টি করেছিলেন।

পাল সৈন্য বাহিনীতে শুধু বাংলার অধিবাসী ছিল তা নয়, ভারতের অন্য অঞ্চলগুলির যুদ্ধজীবী

মানুষরাও পাল সেনাবাহিনীতে যোগদান করত। পাল তাম্রশাসনে 'গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট' প্রভৃতি জাতির উল্লেখ এই ইঙ্গিতটুকু দেয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কয়েকটি পরিবর্তন ব্যতীত পাল শাসন কাঠামো সেন যুগে অব্যাহত ছিল। সেন শাসনকালে ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয়ের পাশাপাশি নতুন কয়েকটি প্রশাসনিক একক যেমন পাটক, চতুরক, আবৃত্তি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন শাসনগণ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিলেন। বর্তমানকালের রাজশাহী, ঢাকা, প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছুটা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। এর থেকে বোঝা যায় উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণ সমুদ্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী থেকে মেঘনা পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বিস্তার ছিল। অন্যদিকে সেনরা বর্ধমানভুক্তির সীমা সঙ্কুচিত করে এর উত্তর অংশে কঙ্কগ্রাম নামক একটি নতুন ভুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সেন শাসকগণ পাল শাসকদের মতই নানা ধরনের উপাধি গ্রহণ করতেন। যেমন লক্ষণসেন ও তাঁর উত্তরপুরুষগণ 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি যেমন গ্রহণ করতেন তেমনি 'অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি' প্রভৃতি নতুন উপাধিও গ্রহণ করতেন। সেন শাসকদের অনুকরণে দেববংশীয় শাসক দশরথদেবও এই সমস্ত উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

সেন শাসনকালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে সামন্ত অমাত্য প্রভৃতিদের তালিকা পাওয়া যায়। পাল যুগের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্যও ছিল। পাল তাম্রশাসনে রানীর নাম পাওয়া যায় না। সেন যুগের তাম্রশাসনে রানীর নাম রয়েছে। চন্দ্র, বর্ম্ম ও কম্বোজ রাজাগণের তাম্রশাসনে রানীর নাম পাওয়া যায়। কম্বোজ, বর্ম্ম ও সেন রাজবংশের তাম্রশাসনে পুরোহিতের নাম রয়েছে। আবার সেন শাসনের শেষ দিকে পুরোহিতের জায়গায় মহাপুরোহিতের উল্লেখ রয়েছে। কম্বোজ, বর্ম্ম ও সেন এই তিন রাজবংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাম্রশাসনে পুরোহিত ও মহাপুরোহিতের উল্লেখ এই তিন রাজবংশের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও রাজশক্তির মধ্যেকার নিগূঢ় সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তোলে।

সেন, শাসনকালে 'মহামুদ্রাধিকৃত' ও 'মহাসর্ব্বাধিকৃত' নামক দুটি নতুন অমাত্যের নাম পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুমান 'মহাসর্ব্বাধিকৃত' শব্দটি থেকে পরবর্তীকালে বাংলায় 'সর্ব্বাধিকারী' পদবীটির উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগেও নতুন কয়েকটি পদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বিচার বিভাগের 'মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ', রাজস্ব বিভাগে 'হট্টপতি' এবং সৈন্য বিভাগে 'মহাপীলুপতি', 'মহাগণস্থ' এবং 'মহাব্যূহপতি' প্রভৃতি। এই সময়কালে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্রমশ সংহত আকার গ্রহণ করছিল তা কম্বোজরাজ নয়পালের তাম্রশাসনে পাঠ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অমাত্যের পদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'করণসহ অধ্যক্ষবর্ণ, সৈনিক-সঙ্ঘ-মুখ্যসহ সেনাপতি, গূঢ়পুরুষসহ, দূত এবং মন্ত্রপাল'। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'করণসহ অধ্যক্ষবর্ণ' এই সমষ্টিসূচক শব্দ প্রমাণ করে যে একজন অধ্যক্ষসহ কয়েকজন করণ (আধুনিক কেরানী)-এর

দপ্তর। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের দপ্তরের একজন অধ্যক্ষ থাকত যার নেতৃত্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মচারী সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করত। একই ধরনের বিভাগ বা সঙ্ঘ সৈন্যদলেও ছিল। প্রতিটি বিভাগের একজন করে অধিনায়ক থাকত যারা সেনাপতির অধীনে কাজ করত। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে নিরুপণের জন্য স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র বিভাগ ছিল। এই কাজে প্রশাসনকে সাহায্য করত 'দূত' এবং গুঢ়পুরুষ' (গুপ্তচর)। সর্বোপরি মন্ত্রিবর্গ (মন্ত্রপাল) রাজাকে পরামর্শ দিতেন ও রাজদায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পালন করতেন। কৌটিল্য বর্ণিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত শাসন পদ্ধতির প্রচুর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন চন্দ্র, বর্ম্ম ও সেনরাজাদের তাম্রশাসনে এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত অন্যান্য কর্মচারীগণ এই উক্তিটি দেখতে পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে শাসন পদ্ধতির বিবরণ আছে, তার নাম 'অধ্যক্ষপ্রচার'। ভাষাগত সাদৃশ্যও এই ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

এই আলোচনা থেকে একটি তথ্য স্পষ্ট যে অন্তত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলায় একটি বিধিবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় শাসকদের সামনে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ছিল শাসন কাঠামো ও শাসনতন্ত্র নির্মাণের একটি সাধারণ আদর্শ। অঞ্চলভেদে এর আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো প্রাচীন বাংলাতে একটি বিশিষ্ট ধরনের শাসন প্রণালী গড়ে উঠেছিল।

আধুনিক গবেষণায় শাসনতন্ত্রের বিকাশকে রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়েছে। ইতিহাসবিদ রণবীর চক্রবর্তী দেখিয়েছেন পুণ্ড্রবর্ধন, রাঢ়, বঙ্গ এবং সমতট প্রাচীন বাংলার এই পাঁচটি উপ-অঞ্চলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্রমশ সংহতরূপ ধারন করে। গুপ্তদের অধীনে বাংলায় দুটি মূল বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ধর্মীয় কারণে রাজস্বমুক্ত জমি দান, দ্বিতীয়ত, সামন্তশ্রেণির উত্থান। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার এই সময়কালকে (৪০০ খ্রিঃ—৬০০ খ্রিঃ) 'Threshold times' বলে বর্ণনা করেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই দুটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাংলায়ও এর ব্যতিক্রম ছিল না বলে রণবীর চক্রবর্তীর অভিমত এবং অধ্যাপক চক্রবর্তী আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই পরিবর্তন সমূহের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর পড়েছিল।

১৫.৫ সারাংশ

প্রাচীন বাংলায় প্রশাসনের ইতিহাস, যা প্রধানত তাম্রশাসন ও লিপি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা অবশ্যই প্রচুর তা নয়। কিন্তু পালদের সময় যে সুসংগঠিত প্রশাসনিক যন্ত্র বিরাজমান ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভূমি অনুদানে থাকা কর্মচারীদের দীর্ঘ তালিকা ছাড়াও, প্রশাসন সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সত্যের স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল কাঠামো সমগ্র অঞ্চল জুড়ে অভিন্ন ছিল যখন পরিস্থিতি পরিবর্তন দাবি করেছে, পাল শাসকরা প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তনও

করেছেন। এটা মোটামুটি উপসংহারে আসা যেতে পারে যে প্রাচীন বাংলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় প্রশাসনিক দক্ষতার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল না।

১৫.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোর বিবর্তন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. গুপ্ত শাসকদের অধীনে প্রাদেশিক প্রশাসন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৩. পাল শাসকদের প্রশাসনিক কাঠামো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৫.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সেনগুপ্ত, নীতিশ, *দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভারস*, লন্ডন, ২০১১।

পল, প্রমোদ লাল, *বাংলার আদি ইতিহাস*, খণ্ড II, কলকাতা, n.d.।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদনা), *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, দিল্লি, ১৯৮৯।

NOTE